লোকটা
কে?
প্রিয়তোষ
মুখোপাধ্যায়

লোকটা কে ?

প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়

আশা বুক এজেন্সী
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা :
ঝর্ণা দত্ত
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৮৯

মূল্য—সাত টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ : গৌতম বসু

মুদ্রণে :
সুশীলা মুদ্রণ
শ্রীশান্তিনাথ পান
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

ঋপ্পন, সিদ্ধার্থ, বুড়ো, হেবল, পিকলু, বাদশা ও অনি।

১

একজন লোক রেড রোডের ধারে একটা গাছের নীচে বসে বাদাম খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। একটা কাক বিরক্ত করছে। কাকটা রোদের দাপটে পাতার আড়ালে বসে ঠোঁট ফাঁক করে হাঁফাচ্ছে আর এক একবার কর্কশ কণ্ঠে কা কা শব্দ করে উঠছে। গরম হাওয়া ভেদ করে দূরের ট্রাম আরও দূরে চলে যাচ্ছিল আর শব্দটা আসছিল খানিক পরে পরে।

পাতাল রেলের কাজ চলেছে তাই এ রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ভীড় বেড়েছে। মোটর বাস সব ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে বলে শব্দ আসছে ঘন ঘন।

উদয় নিরিবিলিতে খানিকক্ষণ বসবে বলে এখানটায় বাদাম ভাজা কিনে এনে বসেছিল গাছটার নীচে। কাকটা! কাকটা বড় জ্বালাতন করছে। ঘাসের উপর যে থলিটা বিছিয়ে উদয় বসেছিল সেটা তুলে তিনচার বার কাকটাকে ভয় দেখিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু কাকটা বার বার ঘুরে এসে বসে ডাকের মাত্রা বাড়িয়েছে।

—কঅ কা! এবার ফট করে উদয় থলিটা সজোরে উপর দিকে ছুঁড়ে মারল। কাকটা উড়ে গেল কিন্তু থলিটা পড়ল না, একটা ডালে আঁটকে গেল।

আশে পাশে যে দু চারটে ইটের টুকরো পড়ে ছিল তাই ছুঁড়ে উদয় থলিটা পাড়বার চেষ্টা করল। —নাঃ গাছে না উঠলে থলিটা পাড়া যাবে না। জবর আটকেছে ডালে।

উদয় গাছে ভালই উঠতে পারত কিন্তু এখন শরীরটা একটু ভারি হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে উদয় গোড়ার খাঁজে পা দিয়ে সামনের একটা ডাল ধরে গাছে উঠে পড়ল। কাকটা আবার ঘুরে এসে কা কা করে উঠল। উদয় তাকাল, একটু এগুলেই থলিটার নাগাল পাওয়া যাবে। একটা ডাল

ধরে আর একটা ডালের উপর পা রেখে উদয় এগুল। গাছটা বোধহয় কাকটার জমিদারি। এক্ষুণি ওর জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে ডালের বাইরে পা রাখতে যাচ্ছিল। নীচে একটা ফিয়েট গাড়ি যাচ্ছে, সামনে হরিণঘাটার বিশাল বপু দুধের গাড়ির আড়ালে পড়ে জোর হর্ণ দিয়ে পাশ চাইছিল। শব্দটা কাকটার মত কর্কশ। উদয় তাকাল। ডালটা আলগা ছিল শক্ত করে ধরে ভাল করে গাড়ির ভেতরে তাকিয়ে দেখল, একটা সাত আট বছরেব বাচ্চা ফুটফুটে মেয়েকে দুটো স্বাস্থ্যবান লোক মাঝখানে বসিয়ে চেপে দুপাশে বসে আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ির ভেতরে চোখ পড়লে মেয়েটাকে দেখা যাবে না।

মেয়েটার চোখ বন্ধ এবং একজনের হাতের রুমাল মেয়েটার নাকের কাছে ঝুলে পড়েছে।

—কি ব্যাপার! উদয়ের বুক ধড়াস করে উঠল। ড্রাইভারের চোখে কালো চশমা। লোকদুটোর মধ্যে যেটা একটু রোগা তার কোলের উপর একটা ছোট্ট রিভলবার পড়েছিল। উদয় পকেট চেপে ধরে এক লাফ মেরে গাছ থেকে নামল। থলি আর পাড়া হল না। গাড়িটা বেরিয়ে গেছে। উদয় ছুটছে উর্দ্ধশ্বাসে। —মেয়েটাকে নিশ্চয় অজ্ঞান করেছে ওরা। উদয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। পকেটের রিভলবার আর খুচরো পয়সায় ঠোকাঠুকি হয়ে শব্দ উঠছে। পকেট চেপে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে উদয়। মাঠের গরম হাওয়া সাঁই সাঁই করে কানের পাশ দিয়ে পেছন দিকে ছুটে চলেছে।

রাস্তায় না উঠে মাঠ পেরিয়ে উদয় সর্টকাট করল। একটা সাঁইতিরিশ নম্বর বাসের পা দানিতে লাফিয়ে উঠে পড়ল। মনে হচ্ছে ফিয়েট ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরবে কারণ ফিয়েটের গতিবিধি সেই রকম। মনে মনে ফিয়েটের নম্বরটা উদয় আউড়ে নিল।

ক্ষীরোদবাবুর বাজারে ননীদার একটা মুদির দোকান আছে সেখানে উদয় কাজ করে। আশে পাশের সব দোকানদাররা জানে উদয় ননীদার

দূর সম্পর্কের পিস্তুতো ভাই। ননীদা সকলকে এই ভাবে পরিচয় দিয়ে রেখেছেন। লোকে বলে অভাবি লোকের হাতে অত বিশ্বাস করে রাত্রে দোকান ছেড়ে যাওয়া উচিৎ নয়। হাতে এক কাঁড়ি করে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠানও নিরাপদ নয়।

ননীদা গম্ভীর হয়ে বাইরে লোহার চেয়ারে বসে আছেন। ন'টা বাজতে চলল, সবাই ঝাঁপ বন্ধ করতে চলেছে। বাজারে খোদ্দেরের চলাচল সেই আটটা থেকেই ভাঁটা পড়ে শেষ হয়ে গেছে, এখনও উদয় এল না।

ননীদা চিন্তায় পড়েছেন। শ'দেড়েক টাকা নিয়ে সকাল এগারটায় উদয় বড়বাজার গেছে আর এখনও দেখা নেই। দু এক জন মুখ টিপে হেসে চলে গেছে। দোকান বন্ধ করার গোলমাল থেমে গেছে দোকানীদের। শুধু তাস খেলোয়াড়দের তাস ফেলার শব্দ আর টিউবকলের শব্দ উঠছে কখনো কখনো।

ননীদা উঠে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় উদয় এল, সঙ্গে ফুটফুটে একটি মেয়ে। একটা নতুন থলিতে বড়বাজারের কিছু জিনিস পত্তর। ননীদা প্রথমে কোন কথা বলতে পারলেন না। উদয়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। —আমি কত সাতপাঁচ ভাবছি, তোর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—! কখন গেছিস বল ত'!

আজ নয় পরে সব বলব। সব মাল আনতে পারিনি।

—মালের কথা বাদ দে। ননীদা বললেন। ভাবলুম তুই হয়ত ধরা পড়েছিস। —তোকে দেখে ধড়ে আমার প্রাণ এল। সঙ্গে এ মেয়েটা কে!

—পয়সা কিছু খরচ করেছি।

—বড় খরচের হাত থেকে আমায় বাঁচালি তুই ধরা না পড়ে। তা কোথায় ছিলি বললি না তো?

—আর কথা বাড়িও না ননীদা রাত হয়েছে। এই বাচ্চা মেয়েটার ভীষণ ঘুম পেয়েছে। ওর ওপর দিয়ে ভীষণ ধকল গেছে সারাদিন। তুমি মেয়েটাকে নিয়ে এক্ষুনি বাড়ি চলে যাও। ও হয়তো কিছু খাবে না—যদি একটু দুধ খায় খাবে। ঘুমে ঢুলে পড়ছিল। নিয়ে যাও।

—আরে মেয়েটা কার বলবি তো? তোর কে হয়? ননীদা একটু ধমকের সুরে বললেন।

—ধর আমার মেয়ে অনেক দিন পর ফিরে পেলাম।

—তোর মেয়ে, চিনলি কি করে দীর্ঘ এতদিন পর! হেঁয়ালী ছেড়ে সত্যি কথা বল।

—দুজন গুণ্ডা এই মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল আমি ছাড়িয়ে আনলাম। উদয় হাসল।

—ইয়ারকি ছাড়। তুই ত একা। ননীদা তাকাল।

—না সঙ্গে আমার বন্ধু ছিল। উদয় পকেট থেকে রিভলবার একটু টেনে বের করে আবার ঢুকিয়ে রেখে হাসল। ঠিক হাতে পড়লে ও ঠিক শয়তানদের খুঁজে বার করে।

ননীদা একটু রাগের স্বরে বললেন। ওটা নিয়ে বেরুতে আমি মানা করি না?—কোন দিন ট্রামে বাসে পকেট থেকে পড়ে যাবে তখন বিপদ ঘটবে।

—নিয়ে যাই না, কি খেয়াল হতে আজ পকেটে নিয়ে বেরিয়ে ছিলাম। খুব কাজে লাগল।—যাও—যাও ওকে নিয়ে যাও।

—আমি নিয়ে যাব না। তুমি কি এসব ছেলে খেলা পেয়েছ! মেয়েটাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় জমা না দিয়ে এখানে নিয়ে এসে মহা বিপদ বাধালে দেখছি। —সর্বনাশ হয়ে যাবে। পুলিশ বলবে মেয়েটাকে আমরা কিডন্যাপ করেছি। তোমাকে এখানে কত ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হয় তুমি জান না।

উদয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বলল, সত্যি ননীদা তোমার বিপদের কথা আমার একবারও মনে হয়নি, না হলে আমি অন্য পথ ভাবতাম। গুণ্ডারা চোখের সামনে রাজত্ব করছে তা সব সময় মুখ বুজে সহ্য করা যায়? বল?—যাক। রাতটা ওকে নিয়ে দোকানে কাটিয়ে দেব কাল যা হয় করব।

ননীদা কি ভাবলেন তারপর মেয়েটার হাত ধরে বললেন, —চল। আজ

রাতটা আমার ওখানেই কাটাক। দোকানে থাকা সহ্য হবে না। নিরাপদও নয়।

ননীদা রাস্তায় উঠে একটা রিক্সা দাঁড় করিয়ে উঠে পড়লেন। উদয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। মেয়েটাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে উদয়ের খেয়াল হল ভোরে উঠতে হবে। খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়তে হবে। ইতিমধ্যে পুলিশ টহল দিতে বেরিয়ে পড়েছে। ওর দিকে তাকাল। —আজ এখনও শোও নি যে?

—সিনেমা দেখে ফিরলাম। এবার খেয়ে শুয়ে পড়ব। আলমারির ওপর থেকে টিফিন কেরিয়ারটা নামিয়ে উদয় হাত পা ধুয়ে গামছা দিয়ে গাটা ভাল করে মুছে নিল।

টিফিন কেরিয়ার খুলে বসল উদয়। ছোট্টু ননীদার বাড়ি থেকে রাত্রের খাবার নিয়ে আসে। আজ ডিমের ঝোল···। বা ঃ। দপ করে সব লাইট নিভে গেল। লোডশেডিং হবার আর সময় পেল না!

হাঁতড়ে দেশলাই খুঁজতে গিয়ে কাঁটাতে ধাক্কা খেল উদয়। তারপর কুপিটা জ্বালিয়ে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল। ভাবছিল ও যদি সোজা থানায় যেতে পারত মেয়েটাকে নিয়ে তাহলে মেয়েটা এতক্ষণে ওর বাবা মার কাছে চলে যেতে পারত। ননীদা যদি একটু সাহস করে থানায় গিয়ে বলে মেয়েটাকে আমি রাস্তায় পেয়েছি তাহলে সব ঝামেলা চুকে যাবে। পুলিশ কি ওটুকুতে ননীদাকে ছাড় দেবে! প্রশ্ন করলে মেয়েটা হয়ত বলবে গাড়িতে যাচ্ছিলাম। তখন ননীদার বিপদ। হয়ত কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন। ননীদা ভাল মানুষ কোন ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দরকার নেই। উদয় ভেবে পেল না কী উপায়ে মেয়েটাকে ওর বাপ মায়ের কাছে ফেরৎ পাঠাবে।

···আমার মেয়ে যদি বেঁচে থাকে এতদিন এর মত হয়েছে নিশ্চয়। উদয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হারিয়ে গেল! না—কেউ ধরে নিয়ে গেল! ও এত ফর্সা হয়ত হত না, কিন্তু মুখশ্রী ছিল ঠিক ওর মার মত। এর মা বাবার কাছে ওদের মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি পারে উদয় ফিরিয়ে দিয়ে

আসবে কিন্তু কি উপায়ে ভেবে পেল না। এক সময় উদয় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর বেলা উদয়ের ঘুম ভাঙ্গল দুধের গাড়ির শব্দে। সামনের মাংসের দোকান ভোর থেকে খোলার তোড়জোড় আরম্ভ করেছে। উদয় উঠে বসল। আজ রবিবার। কাকগুলো চিৎকার আরম্ভ করেছে। উদয় ধড় মড়িয়ে উঠে পড়ল। গত কালের কথা মনে পড়ে গেল। আজ ননীদা নাও আসতে পারেন। কারণ ওদের স্কুল কমিটির আজ মিটিং। মেয়েটার খবর ও পাবে কি করে! অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট্টু চলে আসবে।

উদয় সকালের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সেরে রাস্তার মোড়ে গেল কাগজের উপর চোখ বোলাতে। তখন হকাররা রাস্তায় কাগজের বাণ্ডিল ফেলে সর্ট করতে ব্যস্ত। আজ রবিবার, সে তুলনায় কাগজ তাড়াতাড়ি এসেছে দেখে উদয় একটু খুশি হল।

ভার ভার চোখে কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর একখানা কাগজ নিয়ে উল্টে দেখল। রোজ সকাল বেলা এই ভাবে দোকান খোলার আগে উদয় কাগজ পড়ে নেয়।

উদয় সব কাগজের হেডিং পড়ে একটা কাগজ খুলে ভেতরের খবরগুলো দেখে নিল। হঠাৎ এক স্থানে চোখ স্থির হয়ে, বুকটা দপ্ করে উঠল। উদয় পেছন দিকে তাকিয়ে আবার লেখাটায় চোখ রাখল। —'বালিকা উদ্ধার' হেড লাইনের নীচের অংশ পড়তে গিয়ে লেখাগুলো খাপছাড়া হয়ে উঠল। পকেটে হাত দিয়ে পয়সা বার করে কাগজটা কিনে নেবে ভাবল। —না থাক। নিজের মনেই বলল। কোনদিন ও কাগজ কেনে না আজ হঠাৎ কিনছে কেন! কেউ লক্ষ্য করতে পারে। আর একটু হলে উদয় অসাবধান হয়ে পড়ছিল। একটু দূরে কালিঘাটের মোড়ে গিয়ে উদয় একখানা কাগজ কিনে ভাল করে পড়ল। পুলিশ, ড্রাইভার এবং ওই দুজন গুণ্ডাকে ধরেছে যারা মেয়েটাকে অজ্ঞান করে নিয়ে ওদেরই গাড়ি করে পালাচ্ছিল। ফিয়েট গাড়িটা ওই মেয়েটার বাবার এবং ড্রাইভার ওদের বাড়ির, মাস খানেক আগে বহাল হয়েছে বলে লিখেছে।

কাগজটা তুমড়ে পকেটে রেখে উদয় হন্‌ হন্‌ করে দোকানের দিকে এল। পুলিশ যদি মেয়েটাকে ননীদার বাড়িতে পায়।

ঘুরে এসে উদয় দেখল ছোট্টু দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। উদয় তাড়াতাড়ি চাবির গোছা ছোট্টুর হাতে দিল, খোল বড় দেরি হয়ে গেল। আমি ননীদার বাড়ি যাচ্ছি—কাজ আছে। সকালে ত' ননীদা আজ আসবে না।

ছোট্টু চিৎকার করে কি যেন বলল ততক্ষণে উদয় বড় গেট পেরিয়ে বাইরে চলে এসেছে, শুনতে পেল না। বড় রাস্তায় নেমে পড়ল উদয়।

২

মিষ্টার কুশারী তাঁর বসার ঘরে সোফায় ডুবে যাওয়ার ভঙ্গিতে বসে আছেন। ব্যানার্জীবাবুর দিকে তাকালেন। —আই সি!

—ধারনা করতে পারেন স্যার কি রকম অরাজকতায় চারদিক ভরে গেছে। ব্রড ডে লাইটে আপনার মেয়েকে গাড়ী শুদ্ধু উধাও করে দিচ্ছিল দুজন গুণ্ডা! —ছিঃ। রিভলবার দেখিয়ে আপনার নতুন ড্রাইভারকে কাবু করে ওরা আপনার মেয়েকে নিয়ে জনবহুল মহানগরীর রাস্তার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল!

—জনবহুল মহানগরী! মহানগরীতেই এই সব ঘটনা ঘটে মিষ্টার ব্যানার্জী।

ব্যানার্জীবাবু টাকে দেশলায়ের কাঠির উল্টো দিক ঘসতে ঘসতে বললেন; কিন্তু স্যার আর একজন আরও সাংঘাতিক তস্কর ওদের হাত থেকে আপনার মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল; কোন খবর হল না। এও কি হয়! আমরা কি জঙ্গলের রাজত্বে বাস করছি!

—তাইত! মিষ্টার কুশারী সিগারেট অ্যাসট্রেতে টিপতে লাগলেন।

—এই দেখুন খবরের কাগজ খানায় শুধু লুটপাটে ভরা খবর। তুফান

মেলে বোমা মেরেছে। একজন যাত্রী মারা গেছে—। ব্যানার্জীবাবু কাগজ খানা মেলে ধরলেন।

ছোট টেবিলে রাখা ফোন বেজে উঠল। মিষ্টার কুশারী হাত বাড়িয়ে ফোন তুললেন—হ্যালো। আচ্ছা ঠিক আছে পাশে দিয়ে দিতে বলছি। —বোতাম টিপে অন্য স্থানে মিষ্টার কুশারী কল পাঠিয়ে দিলেন। তারপর হাত বাড়ালেন—দেখি কাগজ খানা।

—হ্যাঁ স্যার। দেখুন।

—ডিসি নর্থ-ইস্ট খুব করেছে মিষ্টার ব্যানার্জী! দেখি শেষপর্যন্ত কি হয়!···বুড়ি আছে!···না নেই?!

—না-না আপনার মেয়ে ঠিকই আছে। মেয়ে ঠিক না থাকলে টাকা ডিম্যাণ্ড করবে কি দিয়ে।

—এনি এ্যামাউন্ট আমি দিতে রাজি—যা চায়। —ওরা বুড়িকে ফিরিয়ে দিক মিষ্টার ব্যানার্জী। মিষ্টার কুশারীর কণ্ঠ ভারি হয়ে উঠল।

—কিছু ভাববেন না। পুলিশ খুব তৎপর। পটাপট সব অ্যারেস্ট করে ফেলল দেখছেন না স্যার। তাছাড়া ডিসি নর্থ-ইস্ট আপনার বন্ধু লোক। হেঁ-হেঁ বাছারা কোথায় হাত দিয়েছে জানে না। ব্যানার্জীবাবু গদ গদ হয়ে মিষ্টার কুশারীর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নিতে গিয়ে একটু সঙ্কোচ করলেন।

—খান না মিষ্টার ব্যানার্জী।

—হেঁ-হেঁ আপনার সামনে···।

আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ খেতে পারেন আপনি। মিষ্টার কুশারী প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। —আজ আপনি দেরি করে অফিসে যাবেন। আগে থানার বড়বাবু তারপর খবরের কাগজে গিয়ে দেখা করে নেবেন।

ব্যানার্জীবাবু সিগারেট ধরিয়ে একটান মেরেই হাত নামিয়ে ঘাড় কাত করলেন।

—আচ্ছা স্যার।

—হ্যাঁ কেশবকে এক্ষুনি এখান থেকে ফোন করে জানিয়ে দিন যে

তিনটেয় মিটিং, সময় চেঞ্জ হয় নি। আর আমার পারসোনাল ফাইলটা ত' ঠিক-ই আছে তাই না ?

—হ্যাঁ স্যার আমি দেখে দিয়েছি।

—ঠিক। আপনি যে দেরি করে অফিসে যাচ্ছেন কেশবকে তাও বলে দেবেন, কারণ কাজগুলো ওই যেন করিয়ে নেয়। —ঠিক আছে !

—হ্যাঁ স্যার।

দেয়াল ঘড়িটা অদ্ভুত শব্দ করে উঠল।

ব্যানার্জী বাবু তাকালেন অবাক হয়ে। ঘড়ির একটা ফোকর দিয়ে একটা কাঠের মুর্গি বেরিয়ে এল।

—বাংলা কাগজে ড্রাইভারের সঙ্গে গুণ্ডাদের যে সাট ছিল সেটা ত লেখে নি !

— না স্যার সেটা লেখে নি। ব্যানার্জী বাবু ঘড়িটার ন'টা বাজা দেখলেন। মুর্গিটা বেরিয়ে কক্ কক্ করে ন'বার ডেকে আবার ভেতরে ঢুকে পড়ল। —বাঃ বেশত।

মিস্টার কুশারী ব্যানার্জী বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—হ্যাঁ স্যার।

—হ্যাঁ ফোন সেরে আপনি চলে যান, নটা বাজল। এই বার কেশব আসবে। সত্যি ঘটনা গুলো যেন সিনেমার পর্দায় যেমন দেখি ঠিক তেমনি ঘটে গেল। চোখের সামনে। ব্যানাজী বাবু ধোঁয়া গিলে ফেলে বললেন। সিনেমা যেন ছুটছে।

—রামজী। মিস্টার কুশারী ডাকলেন।

একটা ছেলে এসে দাঁড়াল।—জি সাহাব।

—লিসা দিদিমণি কো বুলাও।

মিস্টার কুশারীর বড় মেয়ে লিসা ঘরে প্রবেশ করল।—কি ? ধর সায়ের কোন ইনফর্মেশন দিলেন ?

—এখনও কিছু বলতে পারছে না। বাংলা কাগজটা একটু পড় দিকিনি।

লিসা খবরের কাগজটা নিয়ে হেড লাইনটা একটু জোরে উচ্চারণ করে পড়ল, তারপর খবরটা মনে মনে পড়ে বলল।—ওঃ!

—আমি পাশের ঘরে গিয়ে ফোনটা সারি স্থার?

—যান।

ব্যানার্জী বাবু পাশের ঘরে চলে গেলেন।

লিসা কাগজটার উপর মুখ রেখে বলল, জিস্‌টটা হল এই রকম।

—এক মিনিট। বলে মিস্টার কুশারী পাশের ঘরে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন—নিউজটা একটু অন্য রকম দিয়েছে।

—বাংলা কাগজের নিউজ টু দি পয়েন্ট হয় না। পুলিশের কাছে আমাদের ড্রাইভার যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে, সেইটাই লিখেছে।

—হ্যাঁ কি বল্‌ছে?

—বলছে ড্রাইভার যখন বুড়িকে স্কুল থেকে নিয়ে আসছিল তখন ভি, আই, পির মোড়ে একটা রিভলবার দেখিয়ে দুজন লোক গাড়ি থামিয়ে উঠে পড়ে এবং ড্রাইভারকে ওদের নির্দেশ মত গাড়ি চালাতে বাধ্য করে। পেছনে ওদের ট্যাক্‌সী নিয়ে একজন ফলো করছিল সে হেস্টিংসের কাছে গুলি করে গাড়ির পেছনের টায়ার বাস্ট করে গাড়ি থামিয়ে দেয়। তারপর এট্ দি পয়েণ্ট অফ রিভলবার ওদের মুখের সামনে মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়ে।

—লোকটা সাংঘাতিক। জায়গাটা নির্জন তাই রিভলবার চালিয়ে গাড়ি থামিয়ে সরে পড়তে পারল। মিস্টার কুশারী দেশলায়ের কাঠির আগুন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ট্রেতে ফেললেন। দুর্ধর্ষ বাটপাড়! মিস্টার ধর তাই বলছিলেন, এ লোকটা মনে হয় নতুন। এর কোন রেকর্ড নেই তাই ধরতে দু'একদিন সময় লাগবে। টি আই প্যারেডে ধরা পড়বে বলছে। বলছে, যে ট্যাকসি করে ওই বাটপাড় ফলো করছিল তার ড্রাইভার ওকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে।

—দু-একদিনের মধ্যে বুড়ির পাত্তা পেলে বাঁচি। লিসা চিন্তিত ভাবে

কথাটা বলল। —মার প্রেসার ভীষণ বেড়ে গেছে। ডাক্তার ঘোষাল বলছিলেন মাকে ভুলিয়ে টুলিয়ে রাখতে।

—হ্যাঁ তুমি একটু ম্যানেজ কর।

—ভেরি টাফ্ জব। মা কি বুঝতে পারছে না যে বুড়ির খবর এখনও পাওয়া যায় নি! মিস্টার কুশারীর লম্বা সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠতে লাগল। —ল' লেসনেস! ইমারজেন্সিই দরকার। তাই ত বলি···।

—আমি একটু বেরুব!

—আচ্ছা বাংলা কাগজে আমাদের নতুন ড্রাইভার সম্বন্ধে পুলিশের যে সন্দেহ সে বিষয়ে কিছু লেখেনি? পুলিশ বলছে ও অর্ধ সত্য বলছে। মিস্টার কুশারী লিসার দিকে তাকালেন।

—হতে পারে। তবে একটা জিনিস কমন, বলে লিসা ঘড়ির দিকে তাকাল।

মিস্টার কুশারীর সিগারেট আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই। কি কমন?

—কমন হল, ওই বাটপাড়টা যে ট্যাকসী করে এসেছিল—শুধু বুড়িকে নামিয়ে নিয়ে সবাইকে ওই ট্যাকসীতে উঠে কোন দিকে যেন চলে যেতে নির্দেশ করেছিল। এটা ওই ট্যাক্সী ড্রাইভার বলেছে, এবং আমাদের ড্রাইভারও বলেছে। গুণ্ডাচুটোও নাকি একই কথা বলছিল।

—আই সি। পুলিশ রিপোর্ট বলছে ওই বাটপাড় ট্যাক্সী ধরেছিল হেস্টিংসের কিছু আগে—মানে ওই থার্ড ম্যান।

একজন এসে খবর দিল এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। টেবিলের উপর কার্ড রেখে দাঁড়ায়ে রইল।

কার্ড দেখে মিস্টার কুশারী তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। —এস বি ডিপার্টমেণ্টের লোক এসেছে দেখি কি বলে।

মিস্টার কুশারী নীচে নামতে কালো রোগা মত এক বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোক হাত তুলে নমস্কার জানালেন। —মিস্টার কুশারী—

—ইয়াস। কি করতে পারি আপনার জন্যে।

—সময় নষ্ট একটু করব। হেঁ-হেঁ। আমার নাম পবননাথ। এই আইডেনটিটি···।

—থাক। হরি ই-ধার আও।

—না না কোন ফরম্যালিটি করতে হবে না মিস্টার কুশারী। আপনার মনের অবস্থা এখন ফরম্যালিটি করবার মত নয়, পরে হবে। বলুন আপনার মেয়ে কিডন্যাপ্ হয়ে যাওয়া নিয়ে হু চারটে প্রশ্ন করব।

—যত খুশি প্রশ্ন করুন মিস্টার নাথ। আমার মেয়েকে আপনারা তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে দিন, অবশ্য যদি এখনও বেঁচে থাকে। মিস্টার কুশারী সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন।

পাশে রাখা রিসিভার বেজে উঠল। মিস্টার কুশারী তুললেন না, পেছনে ফিরে তাকালেন। একজন তাড়াতাড়ি এসে রিসিভার তুলল। তারপর রিসিভারের মাউথ পিস বন্ধ করে বলল, ব্যানার্জী বাবু ফোন করছেন।

—কি বলছেন ?

—একটা চিঠি সই করতে হবে, পাঠাবেন কিনা, তুটোর মধ্যে দরকার।

—বলে দাও আমি যাব। ওফঃ আপনার সিগারেট ধরানো হয়নি ! সরি। লাইটার জ্বেলে পবনবাবুর সিগারেট ধরিয়ে নিজের সিগারেট ধরিয়ে নিলেন মিস্টার কুশারী।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পবননাথ বললেন, আপনার মেয়ের বয়স সাত, সুতরাং অন্য কোন উদ্দেশ্যে কিডন্যাপ করেনি বোঝা যাচ্ছে। একমাত্র ব্ল্যাকমেলিং করে টাকা চাওয়া। যতটা সম্ভব টেনে বের করে নেওয়া যায়। অবশ্য তৃতীয় উদ্দেশ্য একটা থাকতে পারে প্রতিশোধ নেওয়া···।

মিস্টার কুশারীর ট্রাউজারে সিগারেটের ছাই পড়ল। প্রতিশোধ ! —কেন ? রিভেঞ্জ নেবে ? কে ?

—যদি আপনার কোন শত্রু থাকে। পবননাথ গম্ভীর মুখে বললেন। থাকতেই পারে আপনাদের মত বিজনেস ম্যানদের। —কি বলেন।

—কি করে বলব! কত রকম লোকের কনট্যাক্টে আসতে হয়। বুঝতেই পারছেন।

—প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে কিডন্যাপ্‌ড হলে কি অবস্থা হবে বলা যাচ্ছে না। আপনি এক কাজ করুন দুচারটে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, মেয়ের একটা ছবি ছাপিয়ে দিন, তাহলে অনেক কাজ হবে। মোটা পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিন।

—আজকেই কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছি। মিস্টার ধর আমায় বলেছিলেন এটা করতে। মিস্টার কুশারী বললেন।

—আপনার মেয়ের একটা রিসেন্ট ফটো আমায় দেবেন ত? পবনবাবু মিস্টার কুশারীর দিকে তাকালেন।

—মিস্টার কুশারী চেয়ার থেকে উঠার ভঙ্গি করে বললেন, দিচ্ছি। এই মাণিক বলে হাঁক পেড়ে বসে রইলেন।

একজন বুড়ো মত লোক এসে দাঁড়াল।

—লিসা দিদিমণিকে ডাক। বল বুড়ির বার্থডে-তে যে ছবিগুলো তোলা হয়েছে সেই অ্যালবামটা নিয়ে আসতে।

—জী।

পবননাথ মাণিকের যাবার পথে তাকিয়ে নিল। —হ্যাঁ একটা কথা। আপনার সিগারেট ধরানো হয়নি মিস্টার কুশারী। —যা বলছিলাম। আপনি কি জানেন আপনার মেয়েকে ক্লোরোফর্ম করে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল।

—না মিস্টার নাথ আমি ত' জানি না। আপনার মুখে প্রথম শুনলাম।

—পরীক্ষায় পাওয়া গেছে।

—তাই নাকি!

—কেন আপনার ড্রাইভারই ত' স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে দুজন ডাকাত ওকে রিভলবার দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে দেয়। তারপর চট করে গাড়িতে উঠে আপনার মেয়ের মুখে রুমাল চেপে ধরে। আপনার মেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। এটা অবশ্য আপনার ড্রাইভারের কথা। আমাদের কথা

অন্য হতে পারে। অবশ্য ট্যাক্সী ড্রাইভারও বলেছে মেয়েটা বেহুঁশ ছিল।

—আচ্ছা আমাদের ড্রাইভার কি এ ব্যাপারে জড়িত ছিল।

—নিশ্চয়। ও না হলে ওরা দুজন আপনার মেয়েকে পাচার করতে পারত না। তিনজন অপরাধী তার একজন হল আপনার ড্রাইভার। পবননাথ সিগারেটের শেষাংশ ট্রেতে ফেলে দিলেন।

—লোক চেনা বড় ডিফিক্যাল্ট! মিস্টার কুশারী সিগারেটটা এতক্ষণে ধরালেন।

—ড্রাইভার অপরাধী জেনে আমার কি হবে। চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছিল তার থেকে ছিনিয়ে নিল বাজপাখী। পবননাথ চুপ করে রইলেন। মিস্টার কুশারী আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা যে লোকটা বাটপাড়ি করে বুড়িকে ছিনিয়ে নিল তার সঙ্গে কি প্রথম তিন অপরাধীর কোন যোগাযোগ আছে?

পবননাথ হাসলেন—না। থাকলে এতক্ষণে ও ধরা পড়ত। আপনার মেয়েরও খবর পেতেন। মাণিক একটা খাম হাতে নিয়ে এসে মিস্টার কুশারীর হাতে দিয়ে বলল, দিদিমণি পাঠিয়ে দিল।

মিস্টার কুশারী খাম থেকে ছবি বার করে দেখলেন। —ঠিক আছে। এই নিন মিস্টার নাথ।

পবনবাবু ছবি দেখে আবার খামে পুরে পকেটে রাখলেন। উঠি মিস্টার কুশারী, বলে উঠে পড়লেন।

—আচ্ছা ধন্যবাদ মিস্টার নাথ; কষ্ট করলেন অনেক। মিস্টার কুশারী উঠে দাঁড়ালেন। পবনবাবু হেসে বেরিয়ে গেলেন, এটা আমার ডিউটি।

৩

উদয় বুড়িকে নিয়ে ননীদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। খবরের কাগজ পড়ে ননীদা বুড়িকে আর রাখতে সাহস করেন নি।

উদয়ের ইচ্ছে ছিল আর একটু সময় নেওয়া। সময় পেলে বুড়িদের বাড়ি খুঁজে বের করে যেমন করে হোক ওকে নিরাপদে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসত। বুড়িকে ওর মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে উদয় নিশ্চিন্ত হতে পারত।

ননীদা আর তু ঘণ্টা রাখতেও সাহস পেলেন না, তাই বুড়ির হাত ধরে উদয় বেরুল জনাকীর্ণ মহানগরীর রাস্তায়। ননীদা কোন বিপদে পড়ুক উদয় চায় না। পুলিশ চারদিকে জাল বিস্তার করছে। উদয় টের পাচ্ছে।

একটা বেতের সাদা টুপি কিনে উদয় বুড়ির মাথায় পরিয়ে দিল। রোদ লাগবে না, আর কেউ চিনতে পারবে না।

—চল বুড়ি চিড়িয়াখানা দেখে আসি।

কি করবে মনস্থির করার জন্যে নিশ্চিন্তে ভাববার একটা স্থান দরকার। চিড়িয়াখানা স্থান না হলেও মন্দের ভাল। পুলিশের নজর থাকতে পারে তবে অন্য কারণের জন্যে। ননীদা অনেকগুলো টাকা দিয়েছেন উদয়ের হাতে। অন্যভাবে একটু যদি উদয়কে সাহায্য করা যায় তাই। উদয় বলেছে, হারিয়ে গেলে জানি না। এতটা পথ ডিঙ্গিয়ে চিড়িয়াখানায় যাওয়া মানে বেশ ঝুঁকি নেওয়া। উদয় ভাবল উপায়ই বা কি! আর এক যেতে পারে সার্কুলার রোডে কবরখানায় ফুল নিয়ে। ফুল নেওয়াটা একটা ভনিতা। বুড়িকে নিয়ে কবরখানায় ঢোকা ঠিক নয়। শিশু মনে ভয় পেতে পারে।

চিড়িয়াখানাই একমাত্র স্থান। আংশিক নিরাপদ!

আমার মেয়ের নিরাপত্তা কেউ কি ভাবছে? মরে গেছে, না বেঁচে আছে? আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না!

—বুড়ি তুমি যদি হারিয়ে যাও! উদয় বুড়ির দিকে তাকিয়ে হাসল।

—বুড়ি হাসল। —ধ্যাৎ। চিড়িয়াখানায় চল না কাকু।

—বাড়ি যাবে না?

—চিড়িয়াখানা দেখে তারপর বাড়ি যাব। চল। তুমি কি ভাবছ! বুড়ি উদয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাত ধরে টানল।

—তুমি ওদের বাড়িতে নাকি কিছু খেতে চাইছিলে না, মুখ গোমড়া করেছিলে, ননীদা বলছিল। কেন? উদয় বুড়ির দিকে তাকাল।

—তুমি ওই লোকটার বাড়িতে রাখলে, তোমার দোকানে রাখলে না কেন—তাই ত' রাগ হল।

—ওরে দুষ্টু মেয়ে। দোকানে গরম হত ঘুমতে পারতে না। সারারাত ইঁদুর টুইস্ট নাচ করত। উদয় ট্যাক্সীর খোঁজে চারদিকে নজর দিতে লাগল।

—আমি নাচ দেখব। অমনি বুড়ি বলে উঠল।

—তোমার সামনে ওরা নাচবে না। অন্ধকার হলে ওরা নাচে—তুমি দেখবে কি করে! উদয় দেখছে, একটা ট্যাক্সীও আসছে না। বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে এভাবে আর কত এগুবে।

কিন্তু কাল এমন ত' মনে হয় নি। বুড়িকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে ওকে চাঙ্গা করে তুলেছিল। বলেছিল আমি কাকু তোমাদের গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে পথের ধারে। আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব। বুড়ি আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল—হয়ত অতটা বুঝতে পারে নি। গঙ্গার পুলের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল দেখছিল বুড়ি। পাশে উদয় দাঁড়িয়ে ছিল। মনে কোন চিন্তা ছিল না। বুড়িকে মিষ্টির দোকানে বসিয়ে পেটপুরে মিষ্টি খাইয়েছিল। বুড়ির এই সাত বছরের জীবনে এত স্বাধীন চলা ফেরা খাওয়া আর কখনও হয়নি তাই কাকুর সঙ্গে থাকতে ওর আপত্তি নেই। গঙ্গার পুলের নীচ দিয়ে একটা নৌকো যাচ্ছিল দেখে বুড়ির খুব ভাল লেগেছিল, তাই বলল, আজ নৌকো চড়বে কাকু পুলের নীচ দিয়ে যাব।

—চিড়িয়াখানায় ত নৌকো নেই !—হাতিতে চড়াব। চড়বে ?

বুড়ি চুপ করে কি ভাবল।—বাড়ি কখন নিয়ে যাবে ?

চিড়িয়াখানা দেখিয়ে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমার ছুটি।—না ছুটি নয় অন্য কাজ আছে। উদয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চিড়িয়াখানার পথ বড় দুর্গম মনে হচ্ছে বুড়ি।—ট্যাক্সী।—এই। উদয় একটা চলন্ত ট্যাক্সীর দিকে হাত তুলল। ট্যাক্সীটা থামল না। ড্রাইভার মুখে হাত দিয়ে দেখাল খেতে যাচ্ছে।—তুমি সকালে কি খেয়েছ ?

—মাছ ভাত দুধ আম। বুড়ি বলল।

—বাঃ। আমি ত' কিছু খাই নি। তোমার দায়িত্ব আগে শেষ করি। কিন্তু বড় কঠিন। কাল যত সহজে দুজনের হাত থেকে বুড়িকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল আজ অত সহজে ওকে ওর মা বাবার কাছে পৌঁছে দিতে পারছে না। উদয় ভাবল সঠিক কাজ সহজে কখনই হয় না।

চিড়িয়াখানার জলের ধারে রং বেরঙের পাখি দেখতে দেখতে একটা উপায় ভাববে। একটা ট্যাক্সী আসছে। খালি, না, মিটার ডাউন করা ! উদয় ডাকল, ট্যাক্সী।

—না, ট্রামে যাব। বুড়ি ট্রামে যাবে।

উদয় ট্যাক্সীর দরজা খুলে বলল, ট্রামে অনেক সময় লাগবে, আবার ত বাড়ি ফিরতে হবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়ি ট্যাক্সীতে উঠল। চিড়িয়াখানা জায়গাটা খানিকটা নিরাপদ। ওখানে একগাদা শিশুর মধ্যে আই বি বুড়িকে আলাদা করতে পারবে না। তাছাড়া একদিনে পুলিশ এত দিকে নজর দিতেও পারবে না, সময় লাগবে।

চিড়িয়াখানার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে উদয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বিরাট পরিধির এই ছাড়া ছাড়া ভাব সত্যি উদয়কে অন্যমনস্ক করে তুলল। মনে হচ্ছে ওর নিজের মেয়েকে ছোট বেলায় একবার যেমন এনেছিল এবার তেমনি চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে এসেছে। বুড়ি হাত ছেড়ে দিয়েছে।

বিরাট জলাটায় পাখির সংখ্যা কমে এসেছে। —বুড়ি। উদয় এগিয়ে গিয়ে বুড়ির হাত ধরে ফেলল। এখানে গরমটা কম মনে হচ্ছে।

সিংহ, বাঘ, সাদা বাঘ, শিশু উদ্যান, সরিসৃপ-ভবন একে একে দেখে জলের ধারে এসে বসেছে বুড়ি আর উদয়।

—সাদা কাক কই কাকু? বুড়ি উদয়ের জামায় টান দিল।

উদয় সাদা কাকের খবর রাখে না। খবরের কাগজে একবার যেন কি একটা সাদা কাক, কে ধরে চিড়িয়াখানায় দিয়েছে, তাই পড়েছিল। বলল ওটা উড়ে গেছে।

জলের ধারে ওরা আরও কিছুক্ষণ ঘুরে কিছু পাখি দেখে তারপর একটা রেষ্টুরেন্টের চেয়ারে এসে বসল।—তোমার পা ব্যথা করছে?

বুড়ি বলল, —না।

—কি খাবে বল? খেয়ে দেয়ে এবার তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব। বেলা পড়ে এল। কথাগুলো বলে উদয় বুড়ির মুখভাব লক্ষ্য করল।

—ফুচকা কিংবা সিঙ্গাড়া খাব।

ফুচকা খেলে পেট ভরে না। অন্য কিছু খাও। রসগোল্লা খাবে?

আমি সিঙ্গাড়া খাব। কাল তুমি ওই দোকানে বসে যে বড় সিঙ্গাড়া খেলে! বুড়ি রাগ করে তাকাল।

—কাল ছিল সিঙ্গাড়া খাবার পোশাক। মুখ ভর্তি দাড়ি। আজ ক্লিন সেভড্ সায়েবী পোশাক। আজ আইসক্রীম খাবার পোশাক।

বুড়ি ঠোঁট উল্টে তাকাল।—আবার সানগ্লাস পরেছে!

উদয় হেসে উঠব।—কেন ভাল দেখাচ্ছে না?

—না। আমি সিঙ্গাড়া খাব—তুমি সিঙ্গাড়া খাবার পোশাক আজ পর নি কেন! বুড়ি রাগ করল।

উদয় বলল, তোমার কাকু সাজতে হলে কি ঘিয়ে-ভাজা পোশাক পরতে হয়! বল?

—হয়। তাহলে আমি বাড়ী যাব না।

পাশের টেবিলে একটা মেয়ে এগিয়ে চায়ের কাপ তুলতে গিয়ে সামনের দিকে চেয়ার শুদ্ধ উল্টে পড়ে চা ফেলে দিল। বকা ঝকার শব্দ হতে বুড়ি তাকিয়ে রইল। চা টেবিলে গড়িয়ে ঘাসের উপর পড়ছে। টেবিলের নীচে পাঁউরুটির কাগজ একটা কাক টানছিল উড়ে পালল। উদয় বলল, ওটা বোধহয় সাদা কাক!

—ধ্যাৎ! বোকা কোথাকার।

—চশমা পরেছি তাই বোধহয় সাদা মনে হল।

—তোমার চশমাটা দাও আমি পরে দেখি। বুড়ি হাত বাড়াল।

একজন বয় এসে দাড়াল।—কি!

—সিঙ্গাড়া হুপ্লেট।

বুড়ি হেসে উঠল।—থ্যাঙ্ক ইউ। ভেরি গুড।—ভেরি গুড।

একটা কথা বল ত,—কাল তুমি কোথায় ছিলে দুপুর বেলা? উদয় প্রশ্ন করল।

—স্কুলে!

স্কুলে পরশু ছিলে। কাল ছিলে গাড়িতে তারপর আমার সঙ্গে। উদয় বুঝল বুড়ি গুলিয়ে ফেলেছে—কারণ পরশু ক্লোরোফর্মে বেহুশ অবস্থায় ছিল বলে পরশুর কথা ওর হিসেবের বাইরে চলে গেছে।

—হ্যাঁ তোমার সঙ্গে রাত্রে ননীদার কাছে গেলাম। ননীদা তোমার দাদা?

—তোমায় স্কুল থেকে কে বাড়িতে নিয়ে যায়? ড্রাইভার?

—হ্যাঁ ড্রাইভার। কাল ও দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, তাইত দেরি করে ফেলেছিল, আমার রাগ হচ্ছিল ভীষণ।

—তোমার খুব রাগ! বেশি রাগ করলে বাড়ি চিনতে পারবে না। মাথা গরম করে অন্য বাড়িতে ঢুকে পড়তে পার। উদয় তাকাল।

—কেন?

তোমার বাড়িতে ত আমি ঢুকব না। দূর থেকে তোমায় বলব বুড়ি তুমি তোমার বাড়িতে চলে যাও তখন যদি রাগ কর তাহলে অন্য লোকের বাড়িতে চলে যাবে।

বয় দুটো প্লেটে দুটো দুটো করে সিঙ্গাড়া নিয়ে এল। একটা প্লেটে চাটনি।

—সিঙ্গাড়া দুটো বেশ বড়, তুমি খেতে পারবে?

—পারব।

—চাটনিটা ঝাল। তাই না?

—হ্যাঁ। ই-শ্। ভাল। বুড়ি খেতে লাগল।

—লেকটাউনের কোনখানটায় তোমার বাড়ি? উদয় প্রশ্ন করল।

—লালগেট, আমাদের বাড়ি। দেখা যায়। বুড়ি মুখ তুলল না।

—কি দেখা যায়?

বয় এক কাপ চা দিয়ে গেল। উদয় চা টেনে নিয়ে বলল একটা আইসক্রীম এনে দাও—কাপে।

—চা খাব।

—বোকা মেয়ে। ছোটরা চা খায় না। তোমাদের লাল গেট কোথা থেকে দেখা যায়?

—বুলাদের বাড়ি থেকে।

—বুলাদের বাড়ি কত দূরে? উদয় আবার জিজ্ঞেস করল।

—পার্কের কাছে। আমরা বিকেলে খেলি ওখানে।

—তাই নাকি! তবে ত ভালই হল। পার্ক থেকে তোমাদের বাড়ি দেখা যায়?

—হ্যাঁ কেন যাবে না! গেটটা শুধু দেখা যায় না।

বুড়ি হাত বাড়িয়ে আইসক্রীম কাপ তুলে নিল।

—গেট কেন দেখা যায় না বুড়ি?

—ধূর বোকা, গেট ত সামনের দিকে। সেদিন পার্কে বুলার স্কার্টে কাদা লেগে গিয়েছিল। পড়ে গিয়েছিল স্লিপ খেতে খেতে!

—কোথায় পার্ক?

—আবার কোথায়! ইস ন্যাপকিন দেয় নি জামায় ক্রীম পড়ল!

—মুছে দেব রুমাল দিয়ে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও উঠব।

—একটু পরে।

....

—তোমরা পার্কে খেল?

—খেলিত। ববি সী স করতে গিয়ে উল্টে পড়ে গিয়েছিল।—আমায় চড়তে দেয় না বাবা।

উদয় খুব উৎসাহ প্রকাশ করল। কাল বুলা কার সঙ্গে পার্কে খেলল তুমিত' ছিলে না?

—ডালিয়া মিতা ওরা আসে ত'।

—তাই নাকি! অনেকে আসে তোমার বন্ধুরা! চল এবার উঠা যাক।

—দেরি করে যাব। মিস চলে গেলে যাব।

—ওরে দুষ্ট মেয়ে এত বুদ্ধি! তাহলে আজ বাড়ি ফিরে কাজ নেই, আমার দোকানে শুয়ে থাকবে।—মার জন্যে মন কেমন করবে?

—করবে।

—তোমাদের ড্রাইভার তোমায় ময়দানে নিয়ে আসছিল কেন? বাড়ি না নিয়ে গিয়ে? উদয় হঠাৎ প্রশ্ন করল।

ওর সঙ্গে যে দুজন বন্ধু ছিল তাদের ময়দান দেখাবে বলছিল! আমি জানি না। তুমি বড় বক বক কর। বুড়ি নিজের মনে আইসক্রীম তুলে তুলে খেতে লাগল।

উদয় চুপ করে ভাবতে লাগল। মনে মনে একটা ছক করে নিয়ে বয়কে বলল আমাদের কত হয়েছে। বয় কাউন্টারের দিকে দেখিয়ে দিল। উদয় উঠে কাউন্টারে গিয়ে দাম মিটিয়ে বুড়ির কাছে ফিরে এল।—চল।

—পরে যাব। বুড়ি বসে রইল।

চিড়িয়াখানা কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যাবে কারুকে থাকতে দেবে না। চল আবার ট্যাক্সি পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে, সবাই এক সময় বেরুলে।

বুড়ি আর উদয় চিড়িয়াখানার বাইরে এসে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ পর ওরা একটা ট্যাকসী পেয়ে তাতে উঠে বসল।

৪

পার্কের কিছুদূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উদয় ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল। তরল সন্ধ্যা সবে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। কিছুদূর যাবার পর বুড়ি হাত ছাড়িয়ে ছুটে পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

উদয়ও তাড়াতাড়ি পার্কের মধ্যে গিয়ে ঢুকে দেখল, বুড়ি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুলা, মিতা, ইকা, তানিয়া কেউ আসে নি।

—তুমি আসবে জানে না। উদয় মনে মনে ভাবল বাঁচা গেল। এক্ষুনি বুড়িকে দেখতে পেয়ে ওরা ছুটে এসে প্রশ্ন করত তোকে নাকি ছেলেধরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, গুণ্ডারা কিডন্যাপ করেছিল। কখন এলি, ইত্যাদি প্রশ্নের সামনে পড়তে হত। বুড়ি উত্তর দিতে পারত না। উদয়কে পরিস্থিতি খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলাতে হত, না হলেই বিপদ। এবং ওদের বাড়ি থেকে একশ গজ দূরত্বের মধ্যে এসে আবার নির্বিবাদে চলে যাওয়া কঠিন হত।

—ওই যে বেন্নু যাচ্ছে। বুড়ি চিৎকার করল।

—বেন্নু! বেন্নু কে? তোমাদের বাড়ির কাছে থাকে?

—না দূরে, সিনেমা হলের কাছে থাকে।

—দূরে থাকে? ডাক ডাক—এই বেন্নু।

বুড়ি ডাকল।—বেন্নু। এই···।

বেন্নু ওদিককার লোহার গেট খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল; ঘুরে দাঁড়াল।

—বুড়ি! এত দেরি করে এলি! বেন্নু এগিয়ে এল।

—পেছনে ছাতা নিয়ে বৃদ্ধা একজন মহিলা বেন্নুর পেছন পেছন এসে দাঁড়াল। কে রে অঃ তাই বলি তুমি···।

উদয় বুঝল বৃদ্ধ বেন্নুদের বাড়ির কাজের লোক। বলল, মাসি আমার একটু অন্য কাজ আছে তুমি বুড়িকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে যেতে পারবে।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। চল বুড়ি। বেন্নু আগেই জবাব দিল।

—কেন তুমি কোথায় যাবে। আমাকে আবার নস্যি কিনতে হবে, তোমরা ঝামেলা বাধাও। কাজের লোক মুখের ভাব অন্য রকম করল।

—আমি বোন-পো হিসেবে তোমার না হয় নস্যির পয়সাটা দিয়ে দিচ্ছি। নতুন চাকরি পেয়েছি? কি বল মাসি। উদয় দেখল মাসি জল হয়ে গেছে।—তা দাও পয়সা। নস্যিতে আমার বড় খরচ—দৈনিক দশ পয়সা। বোঝ, যা বাজার পড়েছে আমি কি পারি। ম্যাসি হাত বাড়িয়ে পয়সা নিল। চার আনা পয়সা দেখে একগাল হেসে ফেলল। বেঁচে থাক বাবা।

চাকরি তোমার পারমেট হোক।—আমার ছোটটার চাকরির জন্যে একটু দেখ বাবা।—চল বেনু। বুড়ির হাতটা ধর।—দেরি হয়ে গেল, দেখ দিনি।

উদয় বলল, যাও বুড়ি তুমি মাসির সঙ্গে চলে যাও। বুড়ি কিছু বলবার চেষ্টা করল কিন্তু বলতে পারল না।

—মাসি তুমি বুড়ির বাড়ি চেন ত ?

—ওই ত। হা কপাল—ওই ত লাল গেট। ওর পাশ দিয়েই ত যেতে হবে! চল বুড়ি দেরী করিস নি বাছা।

—বেনু বলল, বুড়ি তোকে নাকি কিডন্যাপ করেছিল!

—বুড়ি বলল, হ্যাঁ। তারপর বলল, না।

উদয়, হাসতে হাসতে বলল, কিডন্যাপ করতে যাচ্ছিল আমি গিয়ে পড়াতে আর করতে পারে নি।

—কাকু তুমি চল। বুড়ি উদয়ের হাত ধরল। আমাকে গল্প বলবে বলেছিল।

—আজ নয়।

—তুমি কি করলে কাকু ? কিডন্যাপ করছিল যখন। বেনু এগিয়ে এল।

—আর নাপ ঝাঁপের কথা কইতে হবে না চল দিকিনি।—আমার কি দাঁড়ালে চলবে—না তোর পিসি বুঝবে।—চ। মাসি ধমক দিল।

উদয় বলল—হ্যাঁ চলে যাও মাসি, তুমি কাজের লোক কতক্ষণ দাঁড়াবে।

—খাটতে কি আর পারি! —সে একদিন ছিলো যখন ভীমের মত খাটতে পারতুম। যোগ্‌গী বাড়ির রান্না এক হাতে ঠেলে দিয়েছি—। এখন বাবা বাতের বেতায় মরি। এই গেল মঙ্গলে উঠতে পারিনি। চল বেনু —হ্যাঁ বাবা তোমার দেশ কোথায় ? উদয় একটু বিপদে পড়ল। —আমার এই মুর্শিদাবাদের ওই দিকে তুমি চিনবে না···।

—ঝড়খালির ওদিকটায় নয়!

—না অন্য দিকে। কেন? উদয় দেখল রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠল।

—বাতের মহাঅষুধ বুড়ো বাঘের সামনের পায়ের কড়ে আঙুলের নখ। ওই নখ আমাদের ঝড়খালিতে পাওয়া যায়, গুনীনরা নে আসে সোন্দর বন থেকে। আমায় কে এনে দেবে! তোমার দেশ ত আমার বাপের বাড়ির দিকে নয়। —চল যাই। মাসি এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়াল।

আমি যাই বলে উদয় পার্ক থেকে একটু পা চালিয়ে অন্য ধার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। মাসি হয়ত আবার কথা আরম্ভ করত।

ওরা হাত তুলে টা টা করল।

উদয় কয়েক বার পেছন ফিরে তাকাল। বুড়ি রাস্তা পার হচ্ছে। বেন্নু আগেই পেরিয়ে গেছে।

একটা পানের দোকানে উদয় গিয়ে দাঁড়াল।

বুড়িদের লাল গেটটা দেখা যাচ্ছে। বুড়িদের বাড়ি বেশ বড়। উদয় পান চাইল। ···না খয়ের দিয়ে নয়।

একটু সময় কাটল ততক্ষণে। উদয় দেখল বুড়ি ছুটে গিয়ে লাল গেটের ভেতর চলে গেল। বুড়িই গেল, কারণ ওর লাল কলারের স্কুলের ড্রেসটা স্পষ্ট দেখা গেল।—হ্যাঁ ওই ত পেছনে বেন্নুও ঢুকছে। তার পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পর মাসি ঢুকল।

উদয় জ্বলন্ত দড়িটা ছেড়ে সিগারেটে টান দিল। একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে গেল।—যাক বুড়ি ওর মা বাবার কাছে পৌঁছে গেল।—হ্যাঁ ঠিকই পৌঁছেচে।

উদয় চলতে লাগল অন্যমনস্ক হয়ে। আবার কবে হারান সন্তানরা তাদের মা বাবার কাছে ফিরে যাবে কে জানে।

উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে একসময় উদয় ননীদার কাছে এল। তুমি সাবধানে থেক, এবার পুলিশ আসবে আমার খোঁজে। তোমার বাড়িতেও যেতে পারে!

—কেন তুই ত মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিয়ে এলি। কোন বিপদ টিপদ

হল নাকি। ননীদা একটু ভয় পেয়ে চেয়ারের পেছনে চাপ দিতে লোহার চেয়ার কোঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে উঠল।

—ননীদা তুমি যেন নতুন হয়ে গেলে। মেয়েটাকে কে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়ে গেল ওরা খুঁজবে না। হয়ত পুরস্কার দেবে বলে খুঁজবে। কাগজে দেখ নি বুড়ির বাবা পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। —তুমি চলে যাও ননীদা আমি আর দাঁড়াব না। আমি ট্রেন ধরব। যদি পারি পরে আসব।

—খেয়ে যা। তোর আর কিছু লাগবে ?

—আর লাগবে না। সময় হাতে নেই পরে যদি দরকার মনে করি তাহলে দেখা করব বুঝলে।

—বুঝলাম। তা যাচ্ছিস কোথায় ? বহরমপুরে ?

—না। চলি ননীদা।

৫

সন্ধ্যার সময় মজলিস বসেছিল বুড়িদের বাড়ির লনে। গণ্যমান্য লোক সব এসেছেন বুড়ি ফিরে এসেছে সেই সংবাদ পেয়ে। এসে তাঁরা খুশির প্রতীক ঠাণ্ডাপানীয়ের গ্লাস হাতে নিয়ে লন-চেয়ারে বসে খোস গল্প করছেন। বুড়িকে পাওয়া গেছে খবর পেয়ে সুহৃদরা ছুটে এসে ঠাণ্ডাপানীয় ব্যবস্থা দেখে জমে উঠেছেন ব্যবসা বা অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং ইন্‌কামট্যাক্‌সের ঝামেলার ব্যাপারেও আলোচনা করছেন।

মিষ্টার কুশারী এখানে নেই। তিনি পানীয় হাতে মিষ্টার সোমের সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘরে বসে। দরকারি কথাবার্তা বলতে লন থেকে—ভেরি সরি বলে সরে পড়েছেন। মিসেস কুশারী এবং লিসা এখানেই আছেন। বুড়ি ছুটোছুটি করছে। মিসেস কুশারী মিস ঘটকের সঙ্গে বসে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত সব রকম খবরাখবর নিচ্ছিলেন।

মানিক এসে বলল, বুড়ি-দিদিমণিকে সাহাব ডাকছেন। মিসেস কুশারী ভ্রূকুঞ্চন করলেন, বুড়িকে নিয়ে এত টানাটানি কেন? কতবার ওকে পুলিশের লোকের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। —বুড়ি। এদিকে এস। যাও বাপি তোমায় ডাকছে।

—না না আমি যাব না খেলছি মিকির সঙ্গে। বুড়ি পা ঘসতে লাগল ঘাসের উপর।

—ডোণ্ট বি অবষ্টিনেট। যাও মিষ্টার সোম হয়ত কিছু প্রশ্ন করবেন। ওঁদের সময় খুব সর্ট।—যাও।

বুড়ি চলে গেল মানিকের সঙ্গে।

এই ক দিনে পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের লোকের বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বুড়ি বিরক্ত হয়ে গেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়ি ঘরে ঢুকল।

মিষ্টার সোমের দিকে বুড়ি তাকিয়ে দেখল, কোলার মত বসে রয়েছে সোফায়। মিঃ সোম বললেন, বুড়ি খাবে?

—কি? ক্যাম্পা?

—হ্যাঁ কোলা।

—আমি খাব না, যাই।

—দাঁড়াও দাঁড়াও, কথাটার জবাব দিয়ে তারপর যাও। মিষ্টার কুশারী হেসে বললেন, বাইরে ছুটোছুটি করছিল তাই এ বদ্ধ ঘরে দাঁড়াতে চাইছে না। —একটু দাঁড়াও মিষ্টার সোম তোমায় এখুনি ছেড়ে দেবেন।

—এক্ষুনি ছেড়ে দেব। মিষ্টার সোম একটা লম্বা চুরট ধরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু জোরে টান মারলেন। —হ্যাঁ একটা জিনিস তোমায় জিগ্যেস করব।—তা দিন দুয়েক ত' হয়ে গেল, একটু ভেবে বল'ত। তোমার কাকু আর তুমি যেদিন মিষ্টির দোকানে বসে মিষ্টি খেয়েছিলে সেদিন কাকু কি মিষ্টি খেয়েছিল?

বুড়ি একবার মিষ্টার সোমের দিকে তাকাল একবার মিষ্টার কুশারীর

দিকে। কাকু কি খেয়েছিল? —সিঙ্গাড়া। না রসগোল্লা খেয়েছিল। —না না তুমি হয়ত ভুল করছ বুড়ি। মিস্টার সোম বললেন।

—হ্যাঁ কাকু বলল, খাও, বেশ ভাল খেতে। আমি যাই?

—যাবে! আচ্ছা। মিস্টার সোম বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন বুড়ি দৌড়ে চলে গেল।

মিস্টার কুশারী বললেন, একটা রসগেল্লো খেতেই পারে তাতে আপত্তির কি আছে।

—না, আপত্তির কিছু নেই। রিপোর্টে আছে অন্য।

ডাক্তারী রিপোর্টে আছে বহরমপুর জেলে যখন ছিল রক্তে সুগার একটু বেশী হওয়ার জন্যে ও চায়ে চিনি খেত না। মিস্টার সোম অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলেন।

এ অন্য লোকও ত হতে পারে মিস্টার সোম। আচ্ছা ননীদার দোকানটা কি করে লোকেট করলেন তারিফ করতে হয়।

—হেঁ—হেঁ—হেঁ। মিস্টার সোম মুখ থেকে চুরট সরিয়ে গেলাস নামিয়ে হাঁসলেন। মিস্টার সোম খুব সাবধানী, হাসির সঙ্গে ছলকে পানীয় যদি জামা কাপড়ে পড়ে তাই গেলাস নামিয়ে রাখলেন।—হেঁ-হেঁ—আমরা সবই পারি, আপনার মেয়ে মানে বুড়িকে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তরগুলো পরীক্ষা করে আমাদের ফোর্স ক্ষীরোদ বাবুর বাজারে ঢু মারে।

—প্রশ্নের উত্তরগুলো কি রকম! মিস্টার কুশারী কৌতূহলী হলেন।

—বুড়ি বলেছিল ট্রামটা ঘড়-ঘড় করে একটা পুল থেকে কিছু দূর এল তখন আমরা নামলাম। —তাহলে দাঁড়ায় শ্যামবাজার পাঁচমাথা কিংবা হাজরার কাছে।

তারপর ও বলেছিল, কাছে রেলিং দেওয়া জায়গায় অনেক বড় বড় পাইপ সব পড়ে ছিল।

মিস্টার কুশারী হাসলেন, বাঃ বাঃ বুড়ি এত মার্ক করেছিল।

—বুড়ি মার্ক করেছিল। অনেকেই অনেক কিছু দেখে কিন্তু সবত

মনে থাকে না। সেই জন্য প্রশ্নকর্ত্তাকে মনস্তত্ত্ববিদও হতে হবে। বুড়ির ক্ষেত্রে শিশুর মনের অবস্থা জেনে সেই ভাবে প্রশ্ন চালাতে হবে। মিস্টার সোম কাঠি জ্বেলে চুরট আবার ধরিয়ে নিলেন। —বুড়ি ননীদার সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়েছিল। সেই সময় একটা সিনেমা হলের জোরালো আলো ও দেখেছিল।

—তাতে কি হল মিস্টর সোম! মিস্টার কুশারী তাকিয়ে রইলেন।

—তার মানে ননীদার দোকানের খুব কাছে সিনেমা হল আছে, তাই ননীদার দোকান শ্যামবাজারের পাঁচমাথার কাছে বা খিদিরপুরের পুলের কাছে বা শ্রীমানী বাজারের কাছে নয়। …এই ভাবে এগুতে হয় মিস্টার কুশারী। মিঃ সোম খালি গেলাশটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন।

—আই সি।

ননী দত্তর দোকান খুঁজে সিওর হয়ে ওকে আমরা এ্যারেস্ট করলাম।

—এ্যারেস্ট! ওর দোষ?

—ও ব্যাটা ঘু-ঘু। উদয় এবং ননী দত্ত দুজনেই বহরমপুরের লোক। উদয়ন, নাম ভাঁড়িয়ে উদয় সেজে দোকানে কাজ করছিল।

—এত খোঁজ পেয়ে গেলেন এত তাড়াতাড়ি!

—আমাদের এগুলো তাড়াতাড়িই করতে হয় মিস্টার কুশারী!

—কোনগুলো?

—আপনার সিগারেট পুড়ে আঙুল ছোঁবে যে। মিস্টার সোম কথা ঘুরিয়ে ফেললেন।

—ওঃ সরি। মিস্টার কুশারী ট্রেতে সিগারেট ফেলে দিলেন।

—আমি এখনও বুঝতে পারলাম না আপনারা উদয়কে, মানে যে আমার মেয়েকে অক্ষত দেহে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে তাকে ধরবার জন্যে এত তৎপর কেন!

—কর্ত্তব্য! ননী দত্তকে এ্যারেস্ট করলাম কিন্তু বেলে ছেড়ে দিতে হল। আইন আইন করলে সব সময় কাজে বড় বাধা আসে। মিস্টার সোম মুখে বিরক্তি আনলেন।

—ননী দত্তর অপরাধ কি ?

—ননী দত্তর অপরাধ আদালত প্রমাণ করবে। আপনার মেয়ের খণ্ড খণ্ড খাপছাড়া উত্তর নিয়ে তার থেকে সত্য উদ্ঘাটন করে অতি ধীর পদক্ষেপে এগুতে হয়েছে, অধৈর্য হলে চলে না। এটাই নিয়ম মিস্টার কুশারী।

মিস্টার কুশারী হয়ত প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলেন। —আপনি যে বলেছিলেন আমার নতুন বহাল করা ড্রাইভার গাড়ি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল তাহলে ও লাইসেন্স রাখে কি করে ?

—এটা আমাকে দেখতে হবে বইকি মিস্টার কুশারী। ও লোকটির আসল নাম বেঞ্জামিন, খৃষ্টান। ভাল ইংরাজী বলে লোককে কাত করতে পারে। এবার অন্য ধান্দা ধরেছিল। দামী উকিল দিয়েছে, মনে হয় ওর পেছনে বড় হাত আছে, দেখা যাক। আপনার মেয়েকে পাচার করতে পারলে ও গোয়ায় গিয়ে গা ঢাকা দিত—সব ছক করা। ব্যাটা স্বীকার করে নি কিছু, নিরপরাধী হিসাবে ছাড়া পেয়ে যাবে হয়ত। দেখা যাক।

—বেঞ্জামিন ! আমি জানি নারায়ণ রাও, ওর নাম।

—হ্যাঁ। এরপর হবে কৃষ্ণ স্বামী। মিস্টার সোম হাসলেন। ওর নাকি নিশানা সাংঘাতিক।

—আই সি। বলতে হবে বাহাদুরী আছে।

—তা আছে। মিস্টার সোম কথা বলে আবার মিস্টার কুশারীর মুখের দিকে তাকালেন। —কার কথা বলছেন ?

—উদয়ের কথা বলছি। আপনাদের কাছেই যা শুনেছি। মিস্টার কুশারী হাসলেন।

কথাটায় মিস্টার সোম যেন খুব খুশী হলেন না। —তা আছে নিশ্চয়। আপনার গাড়িটা যখন খিদিরপুর পার হয়ে অন্য পথ ধরল, তখন বাস থেকে লাফ মেরে ওই লোকটা আই মিন উদয় একটা ট্যাক্সি ধরে সঙ্গে সঙ্গে আপনার গাড়িটাকে ফলো করে। এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে পেছন থেকে গুলি চালিয়ে টায়ার বার্স্ট করে আপনার গাড়ি থামায়

যেখানটা খুব নির্জন। তিনটে লোককে রিভলবারের মুখে কাত করে আপনার মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা বাহাদুরী বলতে হবে নিশ্চয়।

—লোকটা এতটা রিস্‌ক কেন নিল ?

—এই কেনটাইত' আমরা বার করছি মিস্টার কুশারী। আপনি ওর ওপর খুব খুশি। কারণ অক্ষত দেহে ও আপনার মেয়েকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছে, পেলে ওকে পুরস্কার দিয়ে দিতে পারেন আপনি! কিন্তু আমাদের প্রশ্ন একজন নিজের হাতে আইন নেবে কেন? কাছাকাছি থানায় এল না কেন ? ইনফর্ম করল না কেন? 'কেন' প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। যে রিভলবার ব্যবহার করেছিল সেটার কি লাইসেন্স ছিল ? এখান থেকেই আমাদের স্টোরী আরম্ভ হচ্ছে যেখানে আপনারটা শেষ হয়ে গেছে।

মিস্টার কুশারী চুপ করে রইলেন।

মিস্টার সোম উঠে দাঁড়ালেন, চলি অন্য কাজ আছে। আজ অনেকক্ষণ ত' হল। মিস্টার দেব বলছিলেন মিস্টার কুশারী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তাই এলাম, অবশ্য তা ছাড়াও আমি আসতাম। আসাটা আমার দরকার ছিল। —ভাল পান করা গেল।

—আপনার যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করতে পারলাম না মিস্টার সোম। আর একদিন যদি অবকাশের ফাঁকে একবার উঁকি মারেন। হঠাৎ ভাল ভাষা প্রয়োগ করলেন মিস্টার কুশারী।

—সিওর মিস্টার কুশারী, বেশ আনন্দ পেলাম আপনার এখানে। —চলি।

মিস্টার কুশারী সোম সাহেবের সঙ্গে লন পেরিয়ে গেট পর্যন্ত এলেন। একজন লোক সেলুট মেরে গেট খুলে দিল। মিস্টার সোম এবং মিস্টার কুশারী বাইরে বেরুলেন। সোম সায়েবের গাড়ির শব্দ হবার একটু পরেই মিস্টার কুশারী আবার গেটের মধ্যে ঢুকলেন। মিসেস কুশারী এদিকে এগিয়ে এলেন। বুড়ি পুলিশের লাকি-মিতা নাকি যে গন্ধ শুঁকে অপরাধী ধরে দেবে! —সোম সাহেব আবার ডাকছিলেন কেন

বুড়িকে ? দৌড় ত' সব জানা আছে। গুণ্ডাদের হাত থেকে লোকটা বুড়িকে উদ্ধার না করলে কি হত কে জানে। পার্সোন্যাল কলমে ওকে আমি ধন্যবাদ জানাব।

বেগতিক বুঝে মিস্টার কুশারী অন্য দিকে চলে গেলেন।

—যাই সাড়ে ছটায় একটা ফোন করার কথা।

মিসেস কুশারী রাগটা প্রয়োগ করতে না পেরে ডাকলেন।

—মাণিক এধার আও।

মাণিক কাছেই ছিল এগিয়ে এল। ওর হাতে একটা ট্রে। তার উপর একটা বড় কাচের বাটি তাতে আইস-কিউব রাখা রয়েছে এবং ষ্ট্রর বাক্স। মানিক এমন ব্যস্ত সমস্ত ভাব করে দাঁড়াল যেন খুব একটা দরকারী কাজে ব্যস্ত।

মিসেস কুশারী বললেন, তুমি বেন্নুদের বাড়ি গিয়ে ওদের কাজের লোকটাকে যে আসতে বলেছিলে কই আজও ত' এল না। তুমি যাওনি নাকি ?

—যাব না কেন ! আমি বয়লার-চিকিন আনবার সময় বলে এলাম না পরশোঁ ! ওই বুড়িটার পায়ে দরদ তাই আসে নাই হয়ত। যাব আবার আজ। বলে মানিক এগিয়ে গেল।

—আজ কখন যাবে ! কাল সকালে যেও ! বুড়িকে যে উদ্ধার করে আনল—সে আনল কোন স্বার্থে ! পুলিশই বা ওকে ধরতে চাইছে কেন ! নিজের মনেই কথাগুলো বলে মিসেস কুশারী একটা চেয়ারে বসে পড়ে রুমাল দিয়ে চশমাটা মুছে নিলেন। লিসাকে জিজ্ঞেস করলে বলে লোকটা জেল ব্রেক করা আসামী। কিন্তু। —এই বুড়ি এদিকে শোন।

—কি মা। বুড়ি ছুটতে ছুটতে এসে একটা খালি চেয়ার কাত করে ধরে দাঁড়াল।

—চেয়ারে বস । মিস্টার সোম তোমায় কি জিগ্যেস করেছিলেন ? মিসেস কুশারী মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—ওই সেই কাকুর কথা, আমরা দোকানে মিষ্টি খেয়েছিলাম সেই কথা।

—কি কথা! পরিষ্কার করে বল।

—রসগোল্ল। কাকু খেয়েছিল সেই কথা। বুড়ি চেয়ারে পা তুলে হাঁটু মুড়ে দোলাতে লাগল।

—যাও। হোপলেস, পড়তে যাও। কি যে বলে বুঝি না। মিসেস কুশারী বিরক্ত হলেন।

—ওই যে বেন্নুদের কাজের লোক আসছে। মানিক তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল।

গেট খুলে মাসি ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

মিসেস কুশারী নিজেই উঠে পড়ে এগিয়ে গেলেন—এই যে এদিকে, চল আমার সঙ্গে ওপরে চল।

—আবার কোতায়! সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গেলুম।

মিসেস কুশারী মাসির কথার জবাব দিলেন না। একটা কথা উনি এর কাছে জানতে চান। পুলিশ কোন খোঁজ কি মাসির কাছ থেকে পেয়েছে! বারান্দার এক প্রান্তে একটা চেয়ারে গিয়ে মিসেস কুশারী বসলেন। মাসি হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এসে কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, —ভাল আপদ হয়েছে আমার, এ টানে সে টানে সব খবর কি আমি রাখি! বাতের ব্যাথায় আমি বলে শয্যাশায়ী!

—ওই মোড়াটায় বস। মিসেস কুশারী একটা মোড়া দেখিয়ে দিলেন। বাতের ভাল ওষুধ আমি দেব চিন্তা নেই। তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে দিতে পার বুড়ির সঙ্গে সর্বদা থাকবে।

—না বাপু কারে দেব! আজকাল চোর ছ্যাঁচোড়ের জাতে ভরে গেছে দেশ। বলতে বলতে মোড়াটা টেনে নিয়ে মাসি ধপাস করে বসে পড়ল। —এই দেক না, আমার কাছে পুলিশ এসে বলে ওই যে লোকটা, যে সেদিন বুড়িরে পার্কে আমার হাতে দিয়ে গেল, ও নাকি ছেলে ধরা পার্টির লোক। পুলিশে বলেছে আমার কাছে। কাকে বিশ্বাস করি বল দেখি?

—তাই নাকি! মিসেস কুশারী নড়েচড়ে বসলেন। —ছেলেধরা!

ছেলেধরা যদি হবে তাহলে বুড়িকে ফেরৎ দিয়ে গেল কেন, তুমি জিজ্ঞেস করতে পারলে না ?

—বলল। শুধু ছেলেধরা নয়, বড় ডাকাত। ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে শত্রুতা হয়েছে তাই দলের তিন জনকে ধরিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়েছে। পুলিশ এই সব কথা বলে আমাকে বলল—লোকটা ধরা পড়লে তুমি চিনতে পারবে ত'। তোমাকে সনাক্ত করতি হবে। ফ্যাসাদ আর কাকে বলে। বুড়িকে তোমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে দেখি বিপদে পড়লাম।

—তুমি কিছু বলেছ নাকি? পুলিশ কবে এসেছিল তোমাদের বাড়ি ?

—এই নিয়ে দু-তিন বার আসা হল পুলিশের। বলেছে আমি সনাক্ত করতে পারলে আমার আর দুঃখ থাকবে না, টাকা পাব। কথাগুলো বলে মাসি কোমরে হাত দিয়ে সোজা হবার চেষ্টা করল।

মিসেস কুশারী বললেন—তুমি কি বললে ?

—আমি বললাম আমার বয়স হয়েছে। এক লহমায় দেখছি, আমি কাকে বলতে কাকে বলে—নিমিত্তের ভাগি হব! পুলিশের ব্যাপারে না থাকাই ভাল। বললাম, ওসব কি আমার মনে আছে ঝট করে এসেই বুড়িকে দিয়ে চলে গেল। তার ওপর সন্ধ্যে তখন উত্তীর্ণ হচ্ছে। আমি চিনতে পারব নি, আর চোখে কি সে নজর আছে!

মিসেস কুশারী বললেন, আমার কাছ থেকে বাতের ওষুধ তুমি নিয়ে যেও যাবার সময়। হ্যাঁ পুলিশের ব্যাপারে না থাকাই ভাল।

—এতটা বয়স হল—পচার মাকে বোকা পেয়েছে। বলে দুঃখ থাকবে না! না খেয়ে পচার বাবা প্রাণটা দিল দুঃখ থাকবে না! তা কি আর হয় ? বল মা? দারোগাবাবু বলে দেখে না হয় নাও চিনতে পার, গলা শুনে ত' বুঝতে পারবে পার্কে এ তোমার সঙ্গে কথা কয়েছিল! মাসি হঠাৎ উঠবার জন্যে আঁচলটা সাঁই করে চাবি শুদ্ধ পিঠে ফেলল। এদের কথা শুনে অবাক লাগে।

—লোকটা পার্কে তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল পুলিশ জানে?

—তাই ত' দেখতেছি। ছেলেটার কথাবার্তা ভারি সুন্দর। ওর নামে কত কি দারেগাবাবু বলল। উঠি মা সব কাজ পড়ে রয়েছে—কেউ কুটোটি নাড়বে না আমি না গেলে। নস্যি নেব বলে বেরিয়ে ভাবলাম তুমি কি বলছ শুনে আসি। আমার কি দু'দণ্ড বসে কথা বলার জো আছে—পরে এসে আমি ওষুধ নিয়ে যাব।

—যাবে! তোমার ত' আবার কাজ পড়ে রয়েছে। পরে সময় করে এস। বাড়িতে যখন ছুটি পাও, বুঝলে।

—আচ্ছা মা।

—মানিকের হাতে আমি তোমার ওষুধ বের করে পাঠিয়ে দেব, রাত্রে শোবার আগে একটু মালিশ করে লাগাবে কষ্ট অনেক কম হবে।

পচার মা উঠে এগিয়ে যাচ্ছিল। আবার দাঁড়াল। —আচ্ছা।

—আবার আসবে।

পচার মা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল ধীরে ধীরে।

৬

খিদিরপুর পুলের কাছে উদয় যে ট্যাকসি ধরে বুড়িদের ফিয়েট গাড়িটাকে অনুসরণ করেছিল সেটা তিন নম্বর গেটের সত্যনারায়নের। সত্য নারায়ণ নিজে গাড়ি চালায় না, চালায় ওর লোক বিশু। লোকে ওকে বিশুয়া বলে।

বিশুর বৌ মরার আগে সব রকম অপকর্মে বিশু অংশ গ্রহণ করত আপাততঃ সে সব বন্ধ আছে। বৌটা লাইনে কেটে মরতে ওর কেমন সন্দেহ হয়েছিল ইচ্ছে করে মরে নি ত!

বৌটার গোবরের ঝুড়িটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল লাইনের উপর। তার আগের দিন বিশুর ঝগড়া হয়েছিল বৌয়ের সঙ্গে এবং বিশু মেরেছিল খুব।

বিশুর মেয়ে ছুটো বোনের কাছে আছে তাই বাঁচোয়া। তবে খরচা দৈনিক তিন টাকা করে দিতে হয় বোনকে। যেদিন পয়সা খরচ হয়ে যায় সেদিন ওর বোন বুধিয়ার নজর বাঁচিয়ে বেশি রাতে চুপিসাড়ে নিজের ঘরে বিশু ঢুকে পড়ে। পরের দিন বুধিয়া পকেট ঝেড়ে যা পায় তাই গাল মন্দ দিতে দিতে নিয়ে চলে যায়। বিশু দিব্যি করে, সব খরচ পুরো করে দেব বলে, তারপর গা ঢাকা দেয়। বৌ মারা যাবার পর বিশুয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বুধিয়া বলে। তবে মাঝে মাঝে বাংলা খায়, হয়ত গরম হওয়ার জন্যে। তখনই ও বোনের নজর এড়িয়ে খরচা না দিয়ে পালায়।

বিশু যখন বাংলা বলে তখন মনে হয় বাঙ্গালী। আবার যখন হিন্দিতে কথা বলে তখন সন্দেহ হয় ওকি বাঙ্গালী!

বিশু হল গল্পের মাস্টার। হিন্দি বাংলা সমান তালে চালিয়ে ছুনিয়ার খবর দেবে। বিশ্বাস কর চাই না কর। প্রথম দিন ও যখন বুড়ির ছিন্তাই কারী গুণ্ডাদের কি ভাবে অপদস্থ করে একটা লোক ওর ট্যাকসিতে চেপে একটা বাচ্চা মেয়েকে উদ্ধার করল তার গল্প করল তখন পাঞ্জাবী চায়ের দোকানের অনেকে ওর গোখের দিকে তাকিয়ে দেখল কতটা চোখ লাল হয়েছে। —লা বণ্ডিল মাস্টার। নয়া চমক দিচ্ছে। ওদের টিটকারীতে বিশু কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করে নি। ও বলে চলল, জোর স্পীড তুলে গাড়ি হাঁকিয়ে ওই প্রাইভেটকে ধরে ফেললাম।—বাঁ হাতে মাইরি—হুম্ হুম্ ছুটো গুলি ছুটে গেল। ছুটো না একটা! আমার কলেজা তখন কামারের হাপুরের মত উঠছে নামছে···। ভাবছি এ শালা কাকে গাড়িতে তুললাম। আমার মালকড়ি সব ছিনিয়ে খুন করে ফেলে দেবে না ত। ইষ্ট নাম করব নাকি। বাহাছুরের বাচ্চা লোকটা। ট্যাকসি থামতেই লাফ মেরে নেমে মাথা নীচু করে গাড়িটার কাছে ছুটে গেল। ইংলিশ ফিলম দেখছি রে নাড়ু, বলে বাঁপাশের ছেলেটার পিঠে বিশু চাপড় মাড়ল। কথা কটা বলে ও চায়ের গেলাসে চুমুক মেরে গেলাসটা হাতে ধরে রইল। শ্রোতারা যারা টিকা টিপ্পুনি কাটছিল তারা চুপ করে রইল শেষটা শোনার জন্যে। নাড়ু হল বাসের ক্লিনার, বিশুর ভক্ত।

ছুনিয়ার সব গল্প শুনতে ওর জুড়ি কেউ নেই। বলল তারপর কি হল বিশুদা ?

পরের দিন, বিশু সকলের মুখ আগেই লক্ষ্য করে নিয়েছিল। আর এক চুমুক চা খেয়ে বলল, —হিম্মৎ দেখলাম সেদিন। তোরা খববের কাগজে পড়িস নি ? লিখা পড়া করবি না সব মূর্খ হয়ে থাকবি ত কি হবে। লোকটা তিন জনকে ফিয়েট থেকে নেমে আসতে বলল। আমাকে বলল ওদের পেছনে দাঁড়ান। সে কি গলার আওয়াজ রে, না শুনলেই গুলি করবে সঙ্গে সঙ্গে। ছুজন গুণ্ডা রিভলবার সিটের উপর ফেলে দিল। ও কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল। মেয়েটা বেহোশ ছিল। তাজ্জুব ! তিন তিনটে ডাকু ল্যাজ মুড়ে ভয়ে কুকুরের মত কুঁ কুঁ করতে করতে বেরিয়ে এল।

বিশু আবার চা খেতে লাগল।

—তারপর বিশুদা ?

বিশু হেসে বলল, গল্প শুনবি ? মাঙ্গনা ! শালা পৈতৃক জানটা নিয়ে ফিরে এলাম বলে, আর তোরা বিনা পয়সায় গল্প শুনবি ! কাগজে না বেরুলে ত' বলতিস বিশু বাণ্ডিল ছাড়ছে—হেঃ।

নাড়ু বলল, বিশুদা তোমার গায়ে যদি গুলি লাগত।

—তাহলে ত' খবর তৈরী হত, তোরা পড়তিস। পড়তিস কি করে যতসব মূর্খের দল। আমি বলে ভয়ে কাঁপছিলাম তার উপর ওই লোকটা গুণ্ডা তিনটেকে আমার গাড়িতে তুলে দিল, বলল, সোজা মমিনপুর থানায় নিয়ে যান। এই নিন ভাড়া বলে আমায় দশটাকার একখানা নোট হাতে দিল।

একজন পাঞ্জাবি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, আবে বিশুয়া তু জান বুঝকে ফাঁসা থা কিয়া ? ও তেরে ট্যাক্সী মে চড়া ক্যায়সে ?

বিশু বলেছিল, জান বুঝকে কোই আফৎ মোলতা !

—তারপর।

—হেস্টিংসের কাছে হঠাৎ ওই লোকটা ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে

ঢুকে পড়ে বলল সামনের ওই যে ফিয়েট গাড়িটা ডান দিকে বাঁকছে—ফলো করুন। আমি পুলিশের লোক।

একটা কার্ড বের করে সামনে ধরল—পড়তে পারেন ত'—স্টার্ট জলদি।

—তারপর।

—আমি কি বলব আমি ইংরাজি পড়তে পারি না। বললাম, ঠিক হ্যায় সায়েব। গিয়ার টেনে ছুটলাম।
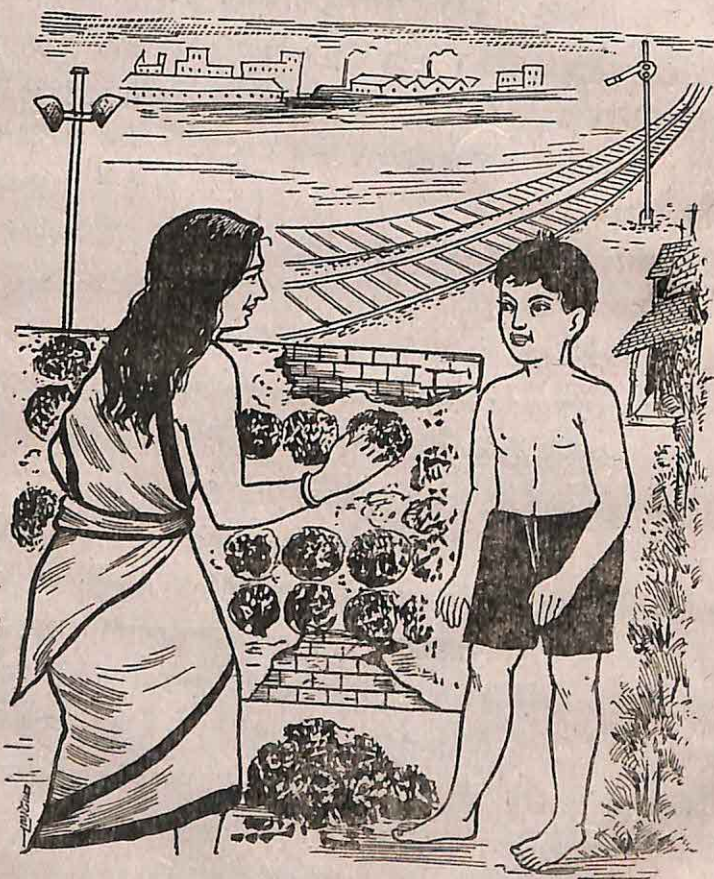
বিশুর খাতির বেড়ে গিয়েছিল এই ঘটনার পরে। চা খেলে বিশুকে দাম দিতে হত না। ফিরতে ওর রাত হত। মেয়ে দুটো সারাদিন রাস্তায়,

লাইনের ধারে বা কলের কাছে ঘুরে বেড়াত। বুধিয়ার সময় কম লাইনের ধারে দেয়ালে ঘুঁটে দিতে দিতে বেলা পেরিয়ে যেত।

সেদিন বুধিয়া গোবরের তাল হাতের নাগালের বাইরে পাঁচিলের গায়ে পর পর ছুঁড়ে যাচ্ছিল এমন সময় বস্তির এক ছোঁড়া এসে খবর দিল বিশুকে একজন বাবু ডাকতে এসেছে।

বুধিয়া তাকাল না। একমনে তালগুলো ছুড়ে শেষ করে বলল, আমি ডালি নিয়ে ছুটব নাকি। বিশুয়ার নাম করতে ওর মনে পড়ে গেল দুদিন টাকা না দিয়ে ও পালিয়ে আছে। ওর ভীষণ রাগ হল। বলল, বিশুয়া বাড়ি নেই বলতে পারলি না।

—তোমায় ডাকছে।

—চল, পুলিশের লোক ত' প্রায় ওর কাছে আসে। এই ত' সেদিন ফাটকে রাত কাটিয়ে এল। বলি ট্যাকসি ছেড়ে দে—বামুনের ছেলে একটা শনি ঠাকুর রাস্তার ধারে বসা। কত পুলিশের সঙ্গে আলাপ আছে—মাসহারী ব্যবস্থা করে চালা—তা নয়। ট্যাকসি চালাবে। —জানটা যেদিন যাবে বুঝবি। বাচ্চা মেয়ে দুটোকে আমার ঘাড়ে দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত! পিসি! —আরে পিসি কি রোজগারে নামবে নাকি? —দেখি কে ডাকছে—কোন আপদ এল এ সময়।

বুধিয়া যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তাই। পুলিশের লোক।

—লোকটি বলল, আমি একটু ঘরে বসব কথা আছে।

— ওর ঘর ত' তালা মারা। ···আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়ান ওর ঘরের চাবি আমার কাছে আছে।

বুধিয়া বিশুর ঘর খুলে দিল। তক্তোপোষ কাত হয়ে রয়েছে, একদিকের ইঁট সরে গেছে তাই না বসে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন।

বুধিয়া বলল আমার ঘরে গিয়ে বসবেন দারোগা বাবু? বিশু ট্যাকসি নিয়ে বেরিয়ে গেলে আসবার ঠিক থাকে না। পাঁচ মিনিটে আসতে পারে আবার পাঁচ দিন পরেও আসতে পারে।

—না আমি বসব না। ও থানায় গিয়ে দেখা করবে কাল সাড়ে আটটার ভেতর। আমি থাকব ও গেলেইদেখা হবে, ভয়ের কোন কারণ নেই বরঞ্চ ওর উপকার হবে। কাল যদি না যায় তাহলে অবশ্য বিপদ আছে। পারলে আজ রাত্রে দশটার মধ্যে চলে যায় যেন। দারোগা বাবু ছোট্ট একটা কাগজ বুধিয়ার হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বুধিয়া কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখে আঁচলে বেঁধে রাখল। ভাবল রাতের বেলা আজ সজাগ থাকতে হবে বিশু কখন ফেরে। দুদিন টাকা দেয় নি লুকিয়ে ফেরবার চেষ্টা করবে। কিন্তু দারোগা বাবু যেতে বলছে, সে খবরটা না দিতে পারলে আবার কি বিপদ আসবে রাম জানে।

আজ আবার এখানটায় গণ্ডগোল হয়েছে। কলোনির ভজন হাসপাতালে নাকি মারা গেছে।

পুলিশের হামলাটামলা হবে ভেবে বিশু ভোর বেলায় ট্যাকসি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। যতসব ঝুট ঝামেলা বস্তির লোকের ওপর এসে পড়বে। বিকেলের ঠিক পরে বিশু ট্যাকসি লাগাল পাঞ্জাবী দোকানে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে আবার ক্ষেপ মারতে বেরুবে। এক্ষুনি একজনকে বলেছে দেরি হবে, চা খাব।

বাসের একটা ছেলে কন্ড্যাক্টারদের সঙ্গে থাকে নাম শঙ্কর, এসে বিশুর পাশে বসল। তুমি যে মেয়েটার কথা বলেছিলে তাকে ত' ফেরৎ দিয়ে গেছে—কালকের কাগজে বেরিয়েছে।

—তাই নাকি?

তুমি এই কাগজ পড়? বাণ্ডিল! না না, বলব না। সত্যি বিশুয়া খুব বেঁচে এসেছে সেদিন।

বিশু অপ্রতিভ হবার লোক নয়, ইস্ কালকের কাগজটাই দেখবার সময় পাইনি—শালা এত ব্যস্ত ছিলাম সারাটা দিন। কি লিখেছে? মেয়েটাকে কে ফেরৎ দিয়েছে?

—যে লোকটা উদ্ধার করেছিল গুণ্ডাদের হাত থেকে।

—হেভি খিঁচে নিয়েছে নিশ্চয়? খিঁচুগ, কাজ দেখিয়ে নিয়েছে।

ফোকটে ত' মারেনি। ওই গুণ্ডা ব্যাটারা যদি গুলি চালাত! আমার বুক ত' ধড়াস ধড়াস করছিল। কিন্তু কারও বুকের পাটা হল না পিস্তলে হাত রাখে। ওর কথায় সিটের উপর পিস্তল ফেলে দিল গুণ্ডারা। বাস্‌রে।

—যদি গুলি চালাত।

মেয়েটার লাগতে পারত, ওই লোকটার বা আমার লাগতে পারত। চারদিন থানায় হাজিরা দিই নি—আজ যাব ভাবছি। চলি। আরে গোবিন্দ! জয় গোবিন্দ জয় গোবিন্দ, তুই এই সময় এখানে?

যে পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা এসে বেঞ্চে বসল তাকে দেখেই বিশু জয় গোবিন্দ বলল। গোবিন্দ ড্রাইভার বিশুর দিকে তাকিয়ে হাসল—'না জিন্দা হ্যায় অভি? তোর দিদির সঙ্গে দেখা হ'ল আজ জরুর বাড়ী যেতে বলেছে। তোর ঘরে পুলিশের লোক এসেছিল।

—পট্টি মত্ মারো, সচ্?

—হ্যারে তোর দিদি বুধিয়া বলল, গোবিন্দ, বিশুর সঙ্গে দেখা হলে জরুর বাড়ী পাঠিয়ে দিও। বাড়ীতে পুলিস এসেছিল। বিশ্ওয়াস কর চায় না কর।

—তোর সঙ্গে কখন দেখা হল?

—পাঁইট নিতে আমি যখন ওধারে গেলাম। বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই।

—আরে সে ত' আমি জানি, পুলিস এবার আমাকে তেল লাগাবে। বিশু বুকটা চিতিয়ে দিল। সাক্ষীর জন্যে।

একটা শাদির কনট্রাক পেলাম, এবার গাড়িটা গিরাজে দেব। গোবিন্দ গোঁফে তা দিতে লাগল।

—চা খাওয়া। খুব কামাচ্ছিস। বিশু গোবিন্দকে বলল। শঙ্কর বলল, ওকে খাতির কর, গুণ্ডাদের পাল্লা থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে।

—এ হি বাত, লে চা পিলে। আপনি মর্জি। কিন্তু বেটা কোন সাক্ষী উক্ষীতে ফাসিস না। গোবিন্দ হাসল।

—মাল ছাড়ো সাক্ষী দেব, কি আছে। আগে তামা পিছে কামা। কি

বলিস ? না হলে আমি কারুকে চিনি না। আমার মুখ বন্ধ। বিশু চুপ করল।

—তুই হাজার চেষ্টা করলেও মুখ বন্ধ করতে পারবি না। গোবিন্দ বলল। নে চা খা! বসে থাকলে তামা মিলবে। দুজনে চা শেষ করে বেরিয়ে পড়ল।

৭

আজকাল ননীদত্ত বিকেলে বেশির ভাগ সময় দোকানে থাকেন। সকালের তুলনায় বিকেলে ভীড় হয় বেশি। ছোট্টু একা সামলাতে পারে না তাই ননীবাবু এসে বসেন। উদয় চলে যেতে ননীদার খুব চাপ পড়েছে। আগে ননীদাকে দোকানে এত মন দিতে আশেপাশের দোকানদাররা দেখেনি, তাই বলে, উদয় ছিল তোমার ডান হাত।

ননী দত্ত চুপ করে থাকেন। ভাবে উদয় কোথায়! পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! পুলিশ ওর হদিস পাবার জন্যে ননীদত্তকে ধরে নিয়ে রেখেছিল লকআপে। এত বয়সে এ মার কি করে সহ্য করল, ভাবলে ননীদার নিজেরই অবাক লাগে। ওরা বিশ্বাস করতে চায়না যে উদয়ের খবর জানা ননীদার পক্ষে সম্ভব নয়। বলেছিল, উদয় আমার দোকানের কর্মচারী। সেদিন ওর মেয়েকে এনে দোকানে রাখতে পারবেনা বলে আমার বাড়িতে রাত্রে রেখে ছিল এর বেশী আমি জানি না।

একথাগুলো উদয় ননীদাকে শিখিয়ে নিয়েছিল পুলিশ জিগ্যেস করলে বলতে। এর অতিরিক্ত আর কথা নয়। উদয়ের স্বচ্ছ ধারণা ছিল পুলিশ আসবে এবং ওর জন্যে ননীদাকে পীড়ন সহ্য করতে হবে। বলেছিল, বলবে বহরমপুরের ছেলে, তবে আমাদের গ্রাম থেকে দশ বার কোশ দূরে ওদের গ্রাম। আলাপ গ্রামে থাকতে ছিল না. দেশের ছেলে শুনে একটা ছোট কাজ দোকানে দিয়েছিলুম। বাস।

কথাগুলো মনে পড়লে ননীদার হাসি পায়। সত্যি কথা বলবে। যেমন "অশ্বত্থামা হত" চিৎকার করে বলবে। "ইতি গজ" এমন ভাবে বলবে

যাতে কেউ শুনতে না পায়। উদয় ইয়ার্কি করত ধর্মপুত্তুর বড় সাংবাদিক হতে পারত কলিতে বেঁচে থকেলে। ননীদা বলত—শ্রীকৃষ্ণ শিখিয়েছিল তাই।

দুজনে পরামর্শ করে নিয়েছিল। বলে উদয় হাসত।

—দুষ্কৃতকারীকে দোকানে কাজ দিয়ে ন্যাকামী হচ্ছে! পুলিশ পেটে ব্যাটমের খোঁচা মেরে কথা বলছিল ননীদত্তর সঙ্গে সেদিন। রাগে শরীর জ্বালা করতে থাকে কথাগুলো মনে পড়লে। তোমার দোকানদারী শেষ করে দেব শালা।

—ভাজা মাছ উল্টে খেতে জাননা। পিঠের দাগগুলো মিলিয়ে গেছে কিন্তু ব্যথা মেলায়নি।

একজন অপরিচিত লোক একখানা একশ টাকার নোট বের করে ভাঙ্গানি চাইল। ছোট্টু স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নেই বলে বসে রইল।

ননীদা হঠাৎ খেয়াল হতে তাকাল। দেখি! হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে সামনে ধরে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। উঠে গিয়ে হাতবাকস থেকে খুলে দশটা, দশ টাকার নোট বের করে লোকটার হাতে দিল।

লোকটা নোটগুলো গুনবার সময় নীচুগলায় বলল, কেউ উদয়ের ছবি নিয়ে এলে বলবেন, ওকে আমি কোনদিন দেখিনি। টাকাটা ঠিক আছে চলি। নোট গোনা এবং কথা বলা এত তাড়াতাড়ি সারল যে ননীদার বোঝবার আগেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

ননীদা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। মুখটা ভাল করে মনে করবার চেষ্টা করল। উদয়ের সঙ্গে কোন দিন দেখেছে কিনা চিন্তা করল। বহরমপুর জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়ে ছিল যারা তাদের মধ্যে কেউ হতে পারে, আবার পুলিশের লোকও হতে পারে। ননীদার গতিবিধি লক্ষ্য রাখছে। গতিবিধি জানান দিয়ে ত' রাখবে না। —তাহলে! —যেই হোক গে। এ চিন্তার ইতি টেনে আবার ভাবলেন, উদয় ত' ভাল কাজই করেছে তবে ওকে ধরবার জন্য পুলিশ এত তৎপর হচ্ছে কেন! কে উদয়ের ছবি আনবে? পাবে কোথায়? যদি আনে! না ওকে

আমি কোন দিন দেখিনি। উদয়কে পুলিশ ধরলে ননীদাকে সনাক্ত করার জন্যে কোর্টে যেতে হবে।—হাঁ ধর্ম্মাবতার—হাঁ। না ও আমার দোকানে কাজ করত না। আগে আমি ওকে কোন দিন দেখিনি। আশে পাশের দোকানদার যদি বলে, হাঁ এই উদয়, ননীদার দোকানে কাজ করত। হঠাৎ ঘুরে ননীদা তাকালেন—হাঁরে ছোট্টু উদয়ের কোন ছবি আছে?

—ছবি? না ছবি নেই। ছোট্টু নুন ওজন করে ঠোঙ্গা বেঁধে রাখছিল, না তাকিয়ে কথাগুলো বলল। ওর হাত খালি থাকলে নুন বা চিনি আগে ভাগে ওজন করে রেখে দেয়।

—পূজোর সময় তোরা ছবি তুলবি বলছিলি?

—উদয়দা তোলেনি।

—কেন ঝগড়া হয়েছিল?

—না-না উদয়দার সঙ্গে ঝগড়া হবে কেন! ছোট্টু মুখ তুলে হাসল।

—কিগো দত্তবাবু উদয়ের খপর পেলে? একজন বৃদ্ধ খালিগায়ে পিঠ চুলকাতে চুলকাতে এসে দাঁড়ালেন। উনি হলেন বাজারের পুরানো লোক। নাম অনন্ত ওঝা।

—এস অনন্তদা একটা কথার জবাব দাও, ননী দত্ত পাশ থেকে বিড়ির কৌটা খুলে একটা এগিয়ে দিল, অনন্তদাকে এবং আর একটা নিজের হাতে নিয়ে ডিবেটা বন্ধ করল।

—কি কথা কর্তা? অনন্ত ওঝা এসময় ননী দত্তর কাছে আসেন গল্প কেচ্ছা করে বিড়ি খেয়ে চলে যান। এসময় তার অবসর, দোকানে বসতে হয় না, ছেলেরা এসে বসে। ননীদা জানতে চায় উদয় সম্বন্ধে অনন্তদারা কতদূর জানে তাই একটু সতর্ক হয়ে প্রশ্ন করল। উদয় গুণ্ডাদের হাত থেকে একটা বাচ্চা মেয়েকে উদ্ধার করে তার বাপ-মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে এল আর তাকেই কিনা পুলিশ ধরবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

—উল্টো পুরাণ। বিড়ি ধরিয়ে একটা টান মেরে অনন্তদা বললেন। তবে কিনা ব্যাপার একটা আচে। পুলিশ হয়ত সাক্ষী সবুতের জন্যে উদয়কে খুঁজছে। আমি বাপু ও ছোঁড়ার কারবার বুঝতে পারি না, লুকিয়ে

মেয়েটাকে ফেরৎ দিয়ে এলি কেন! তুমি ত' চুরি বাটপাড়ি কিছু করনি!

—সে ত বটে। মনে হয় রিভলভার চালিয়ে ছিল সেই ভয়ে লুকিয়ে মেয়েটাকে বাড়ি দিয়ে পালিয়ে গেছে। ননীদা দেশলাই ঠুকে আবার পোড়া বিড়িটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরিয়ে নিল। ভাবল কথাটা যুৎসই হল না।

—ওর কাছে রিভলভার এলো কোতা থেকে! সব্বনেশে ব্যাপার, দেখে ঘুনাক্ষরে বোঝাবার উপায় নেই উদয়কে।......কিগো দত্তবাবু, বিজন ওরা সেদিন ফিসফাস করে বলছিল উদয় নাকি ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে জড়িত ছিল তাইতে ধরা পড়ে জেলে ঢুকেছিল, তারপর জেল ভেঙ্গে পালায়।

—সত্যি নাকি?

—ব্যাঙ্ক ডাকাতি! আমি ত' জানি না। ননীদত্তর বিড়ি আবার নিভে গেছে। দুটো ফাঁকা টান দিয়ে ঢোঁক গিলল। বিজন কার কাছে জানতে পারল!

—কে জানে। তুমি ভাল মানুষ কোন বিপদ আপদে না পড়। আর তুমি এসব জানবেই বা কি করে—জানলে কি ওকে এত বিশ্বাস করে দোকানে রাখতে।

ননী দত্ত সোজা হয়ে বসল। উদয় সম্বন্ধে নানা গল্প বাজারে চালু হয়ে গেছে! আমার কাছে এতদিন ছিল আমি ছোট্টু, বাজারের কেউ ওর সম্বন্ধে কোন খারাপ মন্তব্য করেনি—আশ্চর্য।

—ঐসব ছোকরাদের কতা। বিজনটাই ত' ক্যাশ থেকে পয়সা সরাত—ওর কতা—ছাড় দিকিনি। তবে রিভলবার চালান, এটার জন্যেই ওই সব কতা কেউ বললে খটকা লাগে। অনন্ত ওঝা বিড়ি ফেলে দিল। বুঝল ওর কথায় ননী দত্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে।

ও খারাপ ভেবে কিছু বলেনি।

ননী দত্ত বলল, তুমি বলে ভালই করেছ অনন্তদা। বিজন সম্বন্ধে জানতে পারলাম।

এই মরেছে তুমি যেন কিছু বল না।

—মাথা খারাপ, আমায় পুলিশ ধরে আটকে রেখেছিল আমি আবার ওকে কি বলব! ননী দত্ত আর একটা বিড়ি ধরাল। তবে কি জান অনন্তদা, দোকান করে খাই, এসব কথা চাউর হলে আমায় এবারে আরও পুলিশ বিরক্ত করে মারবে। কোর্টঘর, উকিল, পেশকার করতে করতে বিরক্তি ধরে গেছে। ছেলেপুলে নিয়ে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

—তা'ত বটেই হরিকে বলে দেব, বিজনকে কোড়কে দেবে।

—কোন দরকার নেই অনন্তদা। তাতে ওদের উৎসাহ বাড়তে পারে। উদয়কে ছেলেবেলা থেকে জানি। বড় হয়ে কি করেছে, কোন দলে ভিড়েছে আমি জানিনা। মাঝে মাঝে কলকাতায় এলে এক-আধবার কিছুক্ষণের জন্যে দেখা করে যেত। আমি বহুদিন দেশে যাই না, অন্য কোন খবর পাইনি। একবার শুধু উদয় ওর বিয়ের সময় আমায় পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিল; সেই সেবার গিয়েছিলাম—তারপর মনে পড়ার মত দেশে আর যাইনি। উদয়ের বাবা যখন মারা গেলেন—যাবার ইচ্ছে ছিল যেতে পারিনি। খবর একটু দেরিতে পেয়েছিলাম। ওর মা কবে মারা যায় জানতাম না।

—কেন?

—আমি মাত্র দু' একবার অল্প সময়ের জন্যে দেশে গেছি আর উদয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছিলাম ও স্কুল মাষ্টারী ছেড়ে দিয়েছে। দেশে ছিল না।

—উদয়ের তখন একটি মেয়ে হয়েছে। আমি দেশে আধবেলার জন্যে গিয়েছিলাম, তখন ওই শেষ ওর মাকে নাতনী কোলে করে দাঁড়িয়েছিল, দেখেছিলাম। ওদের বাড়ির সামনে ফণিমনসা দিয়ে ঘেরা বাগানটায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ষ্টেশনে আসছিলাম ৫টার গাড়ি ধরবার জন্যে সাইকেলে। সেই ওর মার সঙ্গে ওই দু'একটা কথা হয়েছিল।

অনন্তদা হাঁক মারলেন, বিজু দুটো চা দিয়ে যা বাবা। কত দিনের কতা!

—তা মাত্র আট বছর হল ননীদা বললেন। বিশু চা দিয়ে যেতে অনন্তদা বললেন, এ দুটো আমার নামে লিখিস।

ননীদা মানা করলেন। না না, আমার দোকানে চা এসেছে তোমার নামে হবে কেন? আর একটা চা দিয়ে যাস। নে ছোট্টু একটু মুড়ি টুড়ি বের কর।

অনন্তদা লোহার চেয়ারে পা তুলে হাঁটু মুড়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। তোমার গ্রামের ছেলে নাড়িনক্ষত্র না জানলে ওত বিশ্বাস করতে। তুমি ভাবলে মেয়েটা বুঝি উদয়ের। তাই বাড়িতে রেখেছিলে। তবে ও ডুব দিয়ে তোমার বিপদ বাধিয়ে গেল তাই আমার কথা। ভ্যাগিস মেয়েটাকে ওর মা বাবার কাছে ফেরৎ দিয়ে গেছে এই যা রক্ষে, না হলে আর দেখতে হত না দত্ত।

না আমার বিপদ কিছু হয়নি। পুলিসের উৎপীড়ন ত' যে কেউ এর ওপর হতে পারে তুচ্ছ কারণে। গেলাসের চা দেখে নিয়ে অনন্তদা বললেন, হুঁ। ব্যাঙ্ক ডাকাতি না লাইসেন্স বিহীন রিভলভার উদয় রেখেছে সে খবর পুলিশে যত পারে নিক। তোমায় টানাটানি না করলেই হল। ননী দত্ত চুপ করে রইলেন।

—পুলিশ ঠিক খুঁজে বার করবে উদয়কে।

ননী দত্ত বললেন, উদয় ধরা পড়লেত' আমার বিপদ।

—না তোমার বিপদ কেন! আসল লোককে পেয়ে গেলে ওরা আর তোমার কাছে ঘেঁসবে না। পুলিশ এত উৎসাহ নিয়েছে নিশ্চয় ও ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে ছিল।

—আমার মনে হয় না।

—তুমি কি করে বুঝছ?

—এইত' রবিবারে আবার সাদা পোশাকে পুলিশ এসেছিল আমার কাছে। নানা প্রশ্ন করে টুকে নিয়ে গেল। খাতির করে চা সিগারেট খাওয়ালাম। ননীদত্ত গেলাসের চা শেষ করে পাশে রাখল। অন্য ব্যাপারে।

—অনন্তদা প্রশ্ন করলেন, অন্য ব্যাপারটা কি?

সেটা ত' আমি বুঝতে পারছি না। ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা পুলিশের মুখে, বা কোর্টে, কারুর মুখ ফসকে আজ পর্যন্ত শুনিনি।

—কে জানে! আদার ব্যাপারী জাহাজের খোজে কি প্রয়োজন? ননী দত্ত বললেন, তুমি এসব কথা কারুর সঙ্গে কইবে না।

—পাগল না মাথা খারাপ! অনন্তদা উঠে পড়লেন। উদয় সম্পর্কে আমরা যা জানি না, মিছেমিছি তা অপরের কাছে বলব কেন। তুমি তার ভাল চাইতে তাই তোমায় জিগ্যেস করলাম।

—অনন্তদা, কেউ যদি বলে তুমি উদয়কে চেন তুমি কি বলবে? অনন্তদা হাসলেন। বলব, উদয়কে? এ নাম ত' শুনিনি। বলে হেসে চলে গেলেন। লোহার চেয়ারে মচ্ করে শব্দ হল।

উদয় সম্পর্কে সকলের ধারনা ভাল। ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথাটা আন্দাজ মাত্র। যেহেতু ওর কাছে রিভলভার ছিল তাই বিজন আর নাড়ুগোপাল কথাটা আলোচনা করেছিল, কথাটার গুরুত্ব ওরা বোঝেনি।

আজ ননী দত্তর কোর্টে ডেট পড়েছিল, ম্যাজিস্টেট আসেননি। দিনটা নিষ্ফল হল অহেতুক। কতগুলো টাকা খেল পেশকার আর উকিল।

উদয় হঠাৎ পরপোকার না করলে ফেরারও হতে হত না আর কোর্টঘরও করতে হত না ননীদত্তকে। অবশ্য ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে থাকতে কেউই পারবে না। কোর্টের ঘরে দাঁড়িয়ে বার বার উদয়ের কথা মনে পড়ছিল ননী দত্তর। উদয় বলত ঝঞ্ঝাট আছে তাই অগ্রগতি আছে। মসৃন মেঝের ওপর জুতো পরে হাঁটা যায় না, পা পেছলায়, পড়ে যাবার ভয় থাকে।

কোন এক দুর্বল মুহূর্ত্তে উদয় একদিন বলেছিল মাঝে মাঝে মেয়েটার কথা মনে পড়লে চাবুকের আঘাত অনুভব করি। বুকে ব্যথা ঘুরপাক খায় মুহূর্ত্তের জন্যে। একদিন একটি মেয়েকে ওর বাবা ননীদার দোকানে লজেন্স কিনে দিচ্ছিল, উদয় তাকিয়ে ছিল অবাক হয়ে।

পরে ননীদা প্রশ্ন করাতে উদয় বলেছিল, আমার মেয়েকে এইভাবে একদিন, আমি চকলেট কিনে দিচ্ছিলাম, মনে পড়ে গিয়েছিল। জেলের

পাঁচিল টপকে প্রথমেই আমি গিয়েছিলাম গ্রামে। গুলি খেয়ে দুজন মারা গেল, বেঁচে রইলাম আমরা তিনজন। ওরা দুজন নির্ধারিত স্থানে চলে গিয়েছিল। আমি সে রাতেই বড় দুঃসাহসের কাজ করে বসলাম। ওদের বললাম, কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমি গ্রাম ঘুরে আসব। কারণ পুলিশ যেদিন আমায় ধরেছিল সেদিন আমি বাড়ি ছিলাম। মেয়েটা মেঝের একপাশে ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিল। ওর মা ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল মুখে কাপড় দিয়ে। আমি দেখে এসেছিলাম।

আমি গ্রামে গিয়ে আমাদের বাড়ী দেখলাম, ভাঙ্গা চোরা। পোড়া বাঁশ কয়েকটা আগুন লাগানোর সাক্ষী হয়ে ঝুলে রয়েছে। এ খবর আমি জেলের মধ্যে পেয়েছিলাম, তবু মনে কিসের যেন একটা আশা ছিল তাই গ্রামে এসেছিলাম। পর পর কয়েকখানা বাড়ির এমন অবস্থা দেখে খুব খারাপ লেগেছিল। তাণ্ডবলীলার পরের দিন আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল গ্রামের লোকেরা অচেতন অবস্থায়। তারপর আর জ্ঞান ফেরেনি—মারা গিয়েছিল; জেলে সে খবর পরে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মেয়ে! তার খোঁজে আমি গ্রামে ছুটে গিয়েছিলাম। আমার ছোট মেয়ে হারিয়ে গেল ননীদা।

আমার সঙ্গে আর দুজন ওরা আসতে চেয়েছিল আমি ওদের কোন ঝুঁকি নিতে দিইনি। ভেবেছিলাম গ্রামে কারুর কাছে মেয়েটার একটা কিছু খোঁজ পাওয়া যাবে। যদি প্রয়োজন হয় দুদিন গাঢাকা দিয়ে থাকব। সে আমি আমার গ্রামে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

সেদিন ননী দত্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন উদয়কে, মনে পড়ছে কথাগুলো। কোর্টের ঘরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল ননী দত্তর পিঠে, কপালে। উদয় তার মেয়েকে খুঁজে পায়নি। উদয়ের কথা শুনে সেদিন ননীদারই ভয় হয়েছিল। উদয় সে রাত্রে গ্রামে থেকে গিয়েছিল। তখন গ্রামের অবস্থা ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। অনেকদিন ননী দত্ত ভয়ে গ্রামে যেতে পারেনি। আঁৎকে উঠতে দেখে উদয় হেসেছিল।

অসম যুদ্ধ। স্বৈরতন্ত্রের স্টিম রোলার তখন দাপটে বেড়াচ্ছিল, লোকে

ভয় পায়নি অবশ্য। —মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম মেয়ের খবর জানে কিনা জানতে। ওরা অবশ্য খুব ভয় পেয়েছিল। শুনেছিলাম আমার মেয়েকে হাসপাতালে ওর মাকে দেখাতে কে যেন নিয়ে গিয়েছিল। কে নিয়ে গিয়েছিল!—মাসির বাড়ির কেউ! ওরা জানে না, বলেছিল তুই বাপু বুঝতেই পারছিস, আমরা আর খোঁজ করতে পারিনি।

হীরুকে পুলিশ ধরে বেধড়ক মার মেরেছে। বুঝলে ননীদা এই মেয়েটা লজেন্স খাবার জন্যে যেমন বায়না করছিল একদিন আমার মেয়েটা ঠিক এই ধরণেরই ভঙ্গি করছিল।

—হীরু তোর কোন মাসির ছেলে বল?

—আমার মাসতুতো ভাই। তারপর উদয় চুপ করে বসেছিল। মাসিত' ওই একটাই।

ননীদা জিজ্ঞেস করেছিল, তারপর কি হল?

কিছুক্ষণ কোন কথাই উদয় বলেনি। পরে নিজেকে শুনিয়েই যেন বলছিল। যে রাতে ভাঙ্গা ঘাটে বসেছিলাম। আমাদের খিড়কির দোর দিয়ে যেটায় যাওয়া যায়—ঠণ্ডিপুকুর। সেই ভাঙ্গা পৈঁটেতে বসে বসে কত কি ভাবছিলাম···হঠাৎ পেছন থেকে পায়ের শব্দ পেলাম। প্রথমেই মনে হয়েছিল পুলিশ। আমি কোথায় আছি ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম। উঠে দাঁড়ালাম।

—কে?

—আরে তুমি! সর্বনাশ! তুমি কখন এলে!

—ফেলুদা তুমি এখানে এতরাতে এই পুকুরে কি করতে? গ্রামে ফেলুদার একটা ঘানি ছিল, ইদানিং অবস্থা চরমে উঠেছিল। লোকে মিলের তেল খেত তাই ফেলুদার অবস্থা দিন দিন চরমে উঠছিল। বলল, এই এমনি বেরিয়েছিলাম।

পরে অবশ্য শুনেছিলাম রাত বেরাতে ফেলুদা বেরিয়ে এর তার বাগান থেকে লাউটা, বেগুনটা ছিঁড়ে নিত। হাট বারের আগের দিন।

ফেলুদা সে রাতে আমায় ওর ঘানির ঘরে খুব যত্ন করে রেখেছিল।

নিজের খাওয়ার সংস্থান নেই কিন্তু আমার জন্যে ভাত যোগাড় করেছিল। আমার কোন কথা শোনেনি। বলেছিলাম, তোমার ছেলেপুলে জানতে পারবে ঘানি ঘরে কেউ আছে, সাত কান হবে···দরকার নেই। ফেলুদা অভয় দিয়েছিল, কেউ জানতে পারবে না। কাকপক্ষী টের পাবে না। আজ রাতে টেনে ঘুম দাও। রাতে যাবার দরকার নেই। কাল গ্রামের, পাশের গ্রামের, এদিকে ওদিকের হাটুরে যখন বিশালক্ষ্মীতলার হাটে যাবে সেই সময় তুমি ওদের দলে ভিড়ে চলে গেলে কেউ টেরটি পাবে না।—হাঁ। আমি বলছি।

ননীদা ভাবছিলেন ফেলুর কথা। ফেলু ওরই বয়সী। মাথায় করে মাটির কালো কলসীতে তেল ফেরি করে দিয়ে যেত। মনটা খুব ভাল-ছিল, ফাউ বলে অনেকে বেশি তেল নিয়ে নিত। আলের ওপর দিয়ে দিয়ে ওদের গ্রামে এসে ঢুকত ফেলু। একদিন ওর বলদের অসুখ হয়েছিল, দেখাতে সদর পশু চিকিৎসালয়ে যাচ্ছিল তখন সাইকেল নিয়ে ননী দত্ত স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছিল। মনে পড়ছে। সে বলদ নেই বেচে দিয়েছে। উদয়কে বলেছিল। ফেলুদা, ভজু ওরা উদয়কে দু'একদিন থাকতে বলেছিল। উদয় হাটুরেদের সঙ্গে ভিড়ে মিশে পরের দিনই চলে গিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে।

পবন নাথ মিস্টার কুশারীর বৈঠক খানায় চুপ চাপ বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। মিস্টার কুশারীর ফিরতে দেরি হবে। মিসেস কুশারী বসতে বলে অন্য কাজে চলে গেলেন। মানিক কতগুলো পাক্ষিক দিয়ে গিয়েছিল টেবিলে। পবন নাথ সেগুলো একটু উল্টে পাল্টে দেখে সন্ধানী চোখ ফেলছিলেন বই ছাড়া আর সব স্থানে।

মানিক আবার এসে একটা সিগারেটের কৌটা আর দেশলাই রেখে চলে যাচ্ছিল।

—এই বইগুলো কে পড়ে? পবন নাথ মানিককে জিগ্যেস করলেন। মানিক দাঁড়াল। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল।—লিসাদিদি মণি পড়ে আর বুড়িদিদি ছবি দেখে।

জবাব দিয়ে মানিক চলে যাচ্ছিল, পবননাথ আবার প্রশ্ন করলেন। তুমি অনেক দিন এখানে কাজ করছ তাই না?

—তা বিশ বছর। মাঝে দশ বছর আমি ঘরে ছিলাম, তখন বুড়িদিদি হয়নি। ছেলে মেয়ের শাদিসুদা করতে দশ বছর ঘরে কাটিয়ে এলাম। মানিক কথাগুলো বলে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে নিল।

—তোমার দেশ বিহারের কোন জায়গায়?

—বিহার সরিফ খাস।

—ঘর থেকে আবার চলে এলে কেন?

—সাহেব মেমসাহেবের চিঠির পর চিঠি। তাছাড়া বৌ মারা গেল। ছেলেদের বৌ বুড়াবুড়ার সম্মান রাখতে পারে না, জমানার হাওয়া অন্য। মানে মানে না থাকাই ভাল, চলে এলাম। বহু যতদিন বেঁচেছিল, আসতে কি দেয়? বলে শহরে গিয়ে কাম নেই, নিজের ঘর গৃহস্থি কে দেখবে।

—ঠিক আছে, তুমি বুড়িদিদিকে ডেকে দাও। আর কারুকে বলতে হবে না, কি করছে বুড়িদিদি? পবননাথ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

পুতুলের ওঁঠে লিপটিক লাগাচ্ছিল। এখন কি করছে দেখি!

—মিসেস কুশারী কোথায় বেরুলেন?

—কত কাজ। আমি বুড়িকে নিয়ে আসছি। মানিক চলে গেল—আবার কি ভেবে ঘুরে এল। বুড়িদিদি যদি আসতে না চায়, লিসা দিদিমনি এলে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলব?

পবন নাথ মানিকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ব্যাটার বুদ্ধি আছে। বাড়ি থেকে কিছু একটা আপত্তি উঠেছিল, মনে পড়তে ঘুরে এসেছে। লিসাও বাড়িতে নেই। দখলদারি করবার কেউ নেই। সোম সায়েব মিস্টার কুশারীকে জানিয়ে ছিলেন আমার লোক আজ আপনার বাড়িতে যাবে, অসুবিধে নেই ত'। মিস্টার কুশারী জিগ্যেস করেছিলেন ওর থাকার যদি দরকার না হয় তাহলে কোন অসুবিধে নেই। মিস্টার সোম বলেছিলেন থাকলে ভাল হত, অবশ্য কোন জরুরী প্রোগ্রাম থাকলে আপনাকে বলব না।

সোম সায়েব পবনবাবুকে নোট পাঠিয়েছিলেন ঠিক সন্ধ্যের সময় মিস্টার কুশারীর বাড়িতে গিয়ে কাজ সারতে। পবনবাবু বুঝেছিলেন ঠিক সন্ধ্যের সময় মিস্টার কুশারী থাকবেন না, মিসেস কুশারী সন্ধ্যের সময় মার্কেটিংয়ে বের হন এবং লিসা ওয়েস্টার্ন মিউজিক শিখতে যায়। পবনবাবু একটু আগে চলে এসেছিলেন, তখনও মিসেস কুশারী বার হন নি। মিসেস কুশারী ওকে দেখে না বেরুলেই অসুবিধে হত।—যাক তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

—বুড়িকে ডেকে নিয়ে এস। তুমি পুরানো লোক তোমার কথা শুনবে। গম্ভীর গলায় হুকুমের সুরে পবননাথ বললেন।

মিস্টার সোমের হাতে একটা ফটো এসেছে বহরমপুর থেকে, উদয় যখন হাসপাতালে ছিল পুলিশ তুলে রেখেছিল ছবিটা। ছবিটার জন্যে মিস্টার সোম অনেক সময় নষ্ট করেছেন। ননীদত্ত এবং উদয় উভয়ই বহরমপুরের লোক। বহরমপুর জেল থেকে যে কজন পালিয়েছিল তার মধ্যে উদয় ছিল স্থানীয় ছেলে এবং পালানোর পর নিজের গ্রামে গিয়েছিল। তারপর তাকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বা নদীয়ার ধারে কাছে আর দেখা যায় নি, সুতরাং ও বড় শহরে গা ঢাকা দিয়েছিল। এই কাজটা উদয়ের বলে আন্দাজ করা হয়েছিল, যদিও পুলিশের খাতায় ওর নাম উদয় ছিল না।

খুব গুরুত্বপূর্ণ। নাম ভাঁড়িয়ে উদয় হয়ে এই লোকটি মনে হয় সেদিন মিস্টার কুশারীর মেয়েকে অবৈধ রিভলভার চালিয়ে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য অন্য ছিল কিনা আমরা জানি না, হয়ত ধরা পড়বার ভয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল মিস্টার কুশারীর মেয়েকে।

আপাতত ননীদত্তর বিরুদ্ধে বুড়িকে একরাত্রি লুকিয়ে রাখার জন্যে চার্জ করা হয়েছে। পরে কেস ম্যাচুয়োর হলে ননীদত্তর ঘুঘুমী ছুটে যাবে। জেলপলাতককে স্থান দেওয়া সাংঘাতিক অপরাধ। মিস্টার সোম আরও বলেছিলেন, কেস তৈরী করতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়। ছবির সঙ্গে আগে উদয় নামধারীকে মিলিয়ে নেওয়া যাক। কতদূর এগুনো যায় দেখি।

বুড়িকে নিয়ে মানিক এসে ঢুকল।—বাবু, বড় দারোগা।

—তুমি দুষ্টুমি কোরো না, বস এই চিয়ারে।

পবন বাবু তাকালেন। —না না তোমার যা ইচ্ছে কর। তবু একটা কথা বলতে পার কিনা দেখি।

মানিক বলল, মাষ্টার দিদিমনি আসবেন এক্ষুনি।

—আসুক। বুড়ি ঠোট বেঁকিয়ে বলল।

—ও তাই তুমি ভালমানুষের মত চলে এলে। পবন নাথ পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন।

বুড়ি ওর হাতের কাপড়ের পুতুলটা উঁচু করে মানিককে শাসাল। কাল ছুটি, আজ পড়ব না দিদিমনিকে বলবে।

—হ্যাঁ, তাই বলে দিও। পবননাথ বললেন। বলবে পুলিশের লোক এসেছে। বলে মানিকের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

মানিক গেল না দাঁড়িয়ে রইল।

—তোমার জন্যে ক্যাড্‌বেরি এনেছি, খাবে, বুড়ি?

—না আমি খাব না।

—ওকে কিছু দিবেন না এই মাত্র ঠাণ্ডা দুধ খেয়েছে। মানিক বলল। —তুমি দাঁড়িও না, কাজে যাও। পবননাথ যেন একটু বিরক্ত হলেন। ইচ্ছে ছিল না তবু মানিক চলে গেল।

—তুমি ফুচকা ভালবাস? পবনবাবু মুখে হাসি আনলেন। আজ তোমার জন্যে ফুচকা আনতাম কিন্তু তেঁতুল জল সব বাসে পড়ে যেত তাই আনতে পারিনি।

—হেঁটে হেঁটে নিয়ে আসতে। বুড়ি বলল।

—তুমি বুঝি সেদিন চিড়িয়াখানায় ফুচকা খেয়েছিলে? টেবিলের নীচে হাত রেখে পবনবাবু একটা টেপের বোতাম টিপে দিলেন। টেপটা ওর পকেটে ছিল।

বুড়ি কোন কথার জবাব দিল না। ম্যাগাজিনগুলোর উপর পুতুলটাকে বসিয়ে বলল, মন দিয়ে টাস্‌ক কর।

পবননাথ টেপের বোতাম টিপে বন্ধ করে দিলেন। তুমি বলছ না কেন বুড়ি? চিড়িয়াখানা তোমার ভালো লাগে নি সেদিন?

—হ্যাঁ কত পাখী দেখলাম। বেবুন ····

পবন নাথ টেপ চালিয়ে দিয়েছেন।—তাই নাকি!

—বড় বড় অস্ট্রিচ, বাঁদর কুমির ব্লাক সোয়ান টাইগার লায়ন কত কিছু। টিয়া সীডাক, সীগাল, সাদাবাঘ। কালোবাঁদর দোল খাচ্ছিল বুঝলে!

—আচ্ছা, তোমায় কাকু বুঝি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। পবননাথ একটা সিগারেট বের করে ধরালেন। অনেক কিছু দেখলে ত।

—হ্যাঁ, হিপো—হাঁ করছে কতো বড় দাঁত বাঃবা···। জলে ডুবেছিল—আমি দেখলাম।

পবন নাথ বললেন, বা তাহলে ত খুব মজা হয়েছিল। কিন্তু হিপোর পুকুরের রেলিং উঁচু তুমি কি করে দেখলে? কাকুর কোলে চড়ে?

কাকু তুলে আমায় দেখাল—যদি পড়ে যেতাম! হুপ করে গিলে নিত, তাই না?

—হ্যাঁ। টুপ করে। কাকু তোমার ছবি তোলেনি চিড়িয়াখানায়?

—বোকা কোথাকার! কাছে ত' ক্যামেরা ছিল না। আমার দিদির আছে। এবার না, সার্কেসে ফট করে ছবি তুলেছিল···ওরা রাগ করছিল!

—ওঃ বুঝেছি। ছবি তুলেছিল তোমার দিদি। তোমার কাকুর ছবি তুমি চিনতে পারবে? পবননাথ, টেপটাকে পয়েণ্ট করলেন পকেটে হাতদিয়ে।

বুড়ি হাসল। কাকুর ছবি ত দিদি তোলেনি। তুমি ফটো তুলবে? দিদি আসুক।—তোমার মাথায় চুল নেই কেন? বুড়ি পবন নাথের মাথার কাছে আঙুল নিয়ে দেখাল।

—না, আমি ফটো তুলবো না···আমার চুল নেই, বিশ্রী ছবি উঠবে।

—তুমি দেখত' এ ছবিটা কার। পবনবাবু কাজের কথায় আসতে চাইছেন।

বুড়ি বলল, এটা তোমার ছবি নাকি ?

পবন নাথ সঙ্গে সঙ্গে টেপ বন্ধ করে দিলেন। দেখইনা ! বুড়ি ছবিটা দেখল। না এর মাথায় চুল একগাদা, এটা কার ফটো তুলেছ ? তোমার ক্যামেরা আছে ?

মানিক এসে খবর দিয়ে গেল, মাস্টার দিদি এসেছেন। বুড়ি অপ্রতিভ হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ছবিটা পবন নাথ বুড়ির হাত থেকে নিয়ে ব্যাগে রেখেদিলেন।

এটা তোমার কাকুর ছবি বুঝতে পারলে না ধেঁৎ বোকা মেয়ে। ছবিটা অনেক আগেকার তাই তুমি বুঝতে পার নি।

আমি বুঝতে পেরেছি।

পবন নাথ উৎসুক হয়ে উঠলেন। কি বুঝলে বল।

—ছবিটা কাকুর।

পবন বাবু আবার টেপ চালিয়ে দিলেন। কি করে বুঝলে বুড়ি ?

তুমি যে বললে ফটোটা কাকুর। বুড়ি অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল। ঝপ করে বোতাম টিপে বন্ধ করে দিলেন পবন বাবু। কেন তুমি বুঝতে পারছ না ! আগে রোগা ছিল, মুখে একটু দাড়ি ছিল।

—চোখে চশমা নেই ত'। চিড়িয়াখানায় তুমি আমাদের দেখেছ ? ভোঁদড়কে বাদাম দিয়েছি। —দেখেছ ? হাতি পয়সা নিয়ে না স্যালুট করল আমাকে।

তাড়াতাড়ি বলত এটা কাকুর ছবি কিনা। এটা নিশ্চয় চিনতে পারবে। তোমার মিস আবার তোমার জন্যে বসে আছেন। পবন বাবুর ধৈর্য্য কমতে লাগল। আর একটা, ছবি বার করলেন। আর্টিস্টকে দিয়ে স্বাস্থ্যবান করে আঁকান ছবিটা বার করলেন। —দেখত' এটা।

এ ছবিটা আগের ছবির থেকে পুলিশের আর্টিস্ট দিয়ে বর্তমান চেহারার যা বিবরণ পাওয়া গেছে সেই রকম করে তৈরি করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পবন বাবু টেপ চালিয়ে দিলেন।

ইউ নটি গার্ল। বলতে বলতে লিসা ঢুকল।

বাড়ি ঢুকতেই মাণিক আমাকে রিপোর্ট দিল বড়বাবু এসেছেন। আমি বুঝতে পারিনি আপনি এসেছেন। বুড়ির মিস্ একা বসে আছেন দেখে আমি ওকে বকতে এসে বুঝলাম ও আপনার কাছে।—সরি।

বসুন মিস কুশারী। পবনবাবু মনে মনে বিরক্ত হলেন এ সময়ে লিসা এসে পড়ায়। বললেন, এক্ষুনি ওকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ভেরি সরি।

লিসা বসে পড়ল। ওঃ ঠিক আছে। আপনি বুড়িকে ফটো দেখাচ্ছেন দেখি।

পবন নাথ ছবিটা লিসার হাতে দিলেন। আগের ফটোটা বার করে বললেন, দেখুন ত' দুটো ছবি এক লোকের কিনা?

লিসা ছবি দেখতে দেখতে জিগ্যেস করল, কার? দুটো ছবির মধ্যে সিমিল্যারিটি আছে। —কার?

—যে আপনার ছোট বোনকে লুকিয়ে ফেরৎ দিয়ে গেছে তার।

আমার তাই মনে হয়েছিল। আপনারা খুব সিরিয়াস দেখি এ ব্যাপারটায়। লিসা হাসল। পুয়র হ্যাণ্ডসাম গাই। তবে নাও হতে পারে এক লোক। কারণ সেকেণ্ড ছবিটা ফটো নয়।

বুড়ি এখনও বলে নি। দেখত বুড়ি এটা তোমার কাকুর ছবি। পবন বাবু টেপের বোতাম টিপলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জুতো ঘসে বোতাম টেপার শব্দটা আড়াল করে দিলেন।

বুড়ি ছবিটা নিয়ে দেখে দিদির মুখের দিকে হাসিমুখে তাকাল। হ্যাঁ এটা কাকুর ছবি। তুমি দেখলে না…।

পবন নাথ টেপ বন্ধ করলেন।

লিসা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার কাকুর ছবি? ওটা ত' আঁকা।

পবন নাথ উঠে পড়লেন। আঁকা হলেও একই লোকের ছবি। সময়ের ব্যবধানে যে পরিবর্তন হয়েছে দ্বিতীয় ছবিতে তা ফোটানো হয়েছে। বিজয় গর্বে পবনবাবু ধীরে ধীরে ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে গেলেন।

ননীদত্তকে আবার দুদিন লক্‌আপে থাকতে হল। দুদিন থাকার পর ননীবাবু ছাড়া পেলেন। জেল ব্রেক করা এক আসামীকে নিজের দোকানে কাজে নিয়োগ করা এবং আশ্রয় দেওয়া এক প্রচণ্ড গর্হিত কাজ। জেল পালানো অপরাধীকে মাসের পর মাস দোকানের কর্মচারী হিসেবে বাহাল করা মানে আইনকে ফাঁকি দিতে সাহায্য করা।

নতুন আর একটা কেসে ননীদত্ত জড়িয়ে পড়লেন। আগের কেস এর তুলনায় জোলো।

ভাবনায় চিন্তায় এ কদিনে ননীদার শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে।

ছোট্টু বলে আপনার বেশী আসবার দরকার নেই আমি ভালই চালিয়ে নিতে পারব। মাঝে মধ্যে অনন্ত বাবু এসে বসেন, এবং নিজেকে শুনিয়ে দুঃখ প্রকশে করেন। ছোট্টু কোন জবাব দেয় না, শুধু বলে বাবুর খবর আর নতুন কি হবে কোর্টঘর আর উকিল ঘর করে সময় কেটে যাচ্ছে।

কাল ননীদা এসে বসেছিলেন সকালের দিকে। ছোট্টুর খানিকটা তাই কম হয়েছিল। ননীদা বলছিল, তোকে কেউ কিছু বলেছে আমাকে পুলিশ ধরেছে বলে।

ছোট্টু বলেছিল, আড়ালে আড়ালে হয়ত। সেদিন যখন যাই কলের ধারে বিজন বলছিল, দুধকলা দিয়ে কালশাপ পুষেছিল ননীদা। তুই কি বললি। ননীদা জানতে চেয়েছিলেন।

ছোট্টু বলেছিল, আমি কিছু জবাব দিই নি, শুধু বলেছিলাম তোমাকে খগেন বাবু একবার বরখাস্ত করেছিল কেন?

'ওসব বাজে কথা', বলে, বিজন চলে গিয়েছিল।

আজ ননীদা আসেন নি। মাসের তিন তারিখ। বাবুদের মাইনে হয়েছে তাই সকালটায় ছোট্টুর বড় পরিশ্রম গেছে। সুতলি পাকাতে পাকাতে বুড়ো আঙুলে ব্যথা হয়েছে।

দুপুরের চান খাওয়া সেরে আঙুলটা দেখতে দেখতে ছোট্টু পিঠ ডালের বস্তার উপর হেলিয়ে দিয়ে এক সময় নাক ডাকাতে লেগেছিল।

এই ভাবে দুপুরে ঘুমানো ছোটবেলা থেকে ছোট্টু আয়ত্ত করে রেখেছে। দুপুরে খদ্দের নেই বললেই চলে। যদি বা হটাৎ কেউ কিছু কিনতে আসে ছোট্টু ঠিক তার প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে আবার নিজে কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়।

আজ পবন বাবু ঠিক এই মহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ছোট্টু ঘুমে অচেতন। মুখে ওঁর স্বভাব সুলভ হাসি টেনে বললেন, ঘুমচ্ছ ? —ঃ্যা…

ছোট্টু সঙ্গে সঙ্গে লাল চোখ মেলে ধরেছে। —কি চাই।

পবনবাবু ভয় পেলেন, উদ্দেশ্য সফল হবে ত'! ঘুম ভাঙ্গানোতে রেগে গেল না ত'। এই আমায় একটা দেশলাই দেবে।

—হ্যাঁ। ছোট্টু উঠে বসল।

—ননীবাবু আমার পরিচিত লোক, ভাবলাম দেখা হবে। তা যখন দোকানে নেই, যাই। আমার একটা দেশলাই দরকার নিয়ে যাই। আবার ভুলে যাব, পরে।

সেদিন বুড়ির ওখানে কাজ ভাল হয়েছে। বোর্ডের সদস্যরা প্রশংসা করেছেন। প্রমোশন! কিভাবে আরম্ভ করলে এ ব্যাটা চোটবে না। প্রথম ঘুম ভাঙ্গানোর রিস্ক ত' কেটে গেল মনে হচ্ছে। এই নাও! ক' পয়সা ভাই। পবননাথ একটা নোট এগিয়ে দিলেন।

—খুচরো দিন।

—খুচরো ত' নেই। আমি ননীবাবুর বাড়িতেই যাই। যাক দেশলাই রেখে দাও। আমি পুলিশ থেকে আসছি। তাড়া আছে।

পুলিশের নাম শুনে ছোট্টুর হাত থেকে দেশলাইটা ফসকে গুড়ের টিনে পড়ল।

—ইশ বলে ছোট্টু দেশলাই তুলে একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে পবননাথের দিকে এগিয়ে দিল। পরে দেবেন। নিয়ে যান।

—তাহলে একটা অন্য বাস্‌ক দাও। পবননাথ, সব কিছু ভাল করে

দেখে নিয়ে এবার প্রস্তুত হলেন। তা তুমিও ত' বলতে পারবে, ননীবাবুর কাছেই যে যেতে হবে তার কি কথা আছে। তুমিও বলতে পারবে। একসঙ্গে এতদিন কাজ করলে, বসলে, শুলে খেলে তুমি বরঞ্চ ননীবাবুর চে'য় ভালই বলতে পারবে।
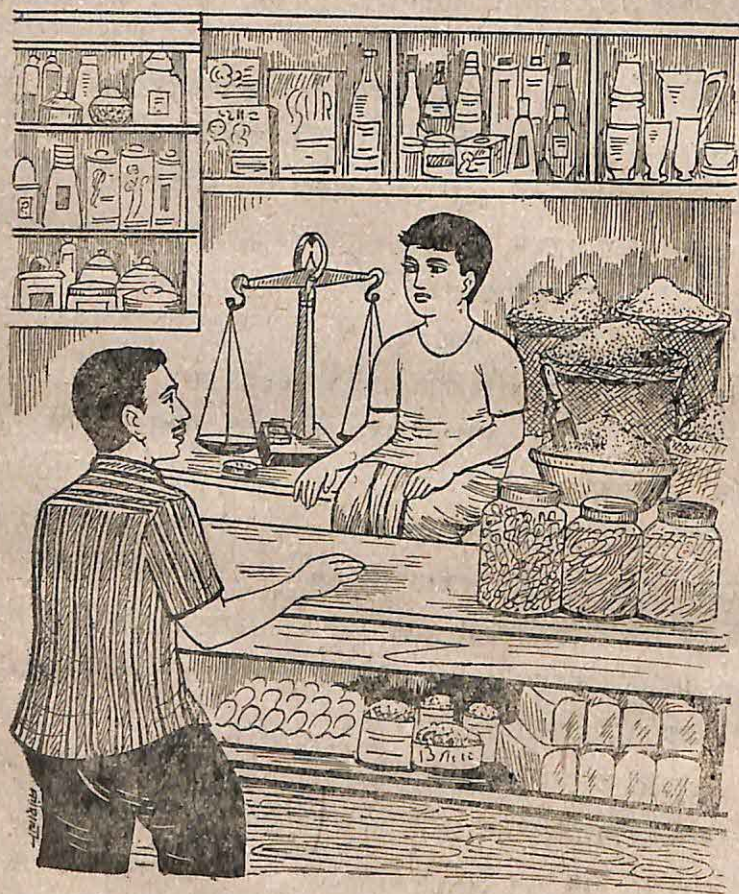
ছোট্টুর ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছুটে গেছে। পা টেনে গুটিয়ে বসল। সেদিন একটা ছোকরা মতো লোক এসে, এ প্রশ্ন, সে প্রশ্ন করেছিল ছোট্টুকে। তারপর দোকানের ভিড় বাড়তে আর সুবিধা হয়নি, চলে গিয়েছিল। ছোট্টু মনে মনে কথাগুলো ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করল, কার কথা বলছেন?

—উদয়বাবুর কথা। উদয়—।

আমি রাত্রে বাবুর বাড়িতে গিয়ে শুতাম। একসঙ্গে শুতাম না, একসঙ্গে খেতাম না। ছোট্টু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

সেদিন ওই লোকটাকে নানারকম প্রশ্ন করে যাওয়ার পর, ননীবাবু ছোট্টুকে তালিম দিয়ে রেখেছেন, কিভাবে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। ছোট্টু দেখতে ছোট হলে কি হবে বুদ্ধি ধরে সাংঘাতিক। খর্বাকৃত দেহ মুখে অল্প দাড়ি, বছর তিরিশ বয়স। কুড়ি বলে ভুল হয়। সার্টের পকেটে সর্বদা পেন গোঁজা হল ছোট্টু বৈশিষ্ট। সামনের উঁচু দাঁতের জন্যে কথাগুলো ওর জড়ানো।

মাপা মাপা কথা শুনে পবনবাবু বুঝলেন উনি এক ক্ষণজন্মা পুরুষের সম্মুখিন হয়েছেন। খুব সাবধানে ওঁকে এগুতে হবে। ঘুমের আবেগে যখন ছোট্টু সতর্ক ছিল না পুলিশের নামে প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। এখন সে ভাব কাটিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। পবনবাবু টাকের পেছন দিকটা চুলকে নিলেন। তাহলে তুমি আর কি জানবে। সারাদিন খাটনির পর রাত্রে ঘুমনোর আগে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করতে করতে মানুষ ঘুমায়। তখনই সুখ দুঃখের গল্প হয়।

ছোট্টু হাসল। আমরা পড়ি আর ঘুমাই। 'ক' বলতে সবুর সয় না।

—সারাদিন খুব খাটনি যায় ত!

—হ্যাঁ। তা একটু যায়।

—কত মাইনে দেয় ননীবাবু? এত ত আয়! পবন নাথ অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ছোট্টুর মুখ দেখে নিল।

—আমাদের গরিবদের ভালই দেন। আমার ছেলের ভাতে কোমরের গোট দিয়েছিলেন তাছাড়া খরচার নগদ টাকা। বাবুকে বলতে হয় না। হু ভাল হয়েছে। পবন বাবু ভাবছিলেন উদয়ের ছবি দেখালে ও অস্বীকার করবে কিনা বুঝা যাচ্ছে না। ছোকরা একটি আস্ত শৃগাল। বললেন, তোমার ছেলের ভাত কবে হল?

তা বছর তিন সাড়ে তিন হবে। অত হিশেব নেই। মা বলে

ছোট্টু হাই তুলল। তারপর কি ভেবে মুখে মৌরি ফেলে নিল কয়েকটা। কোন কথার জবাব দেবার আগে মৌরি চিবানোর অজুহাতে ভেবে নেওয়া যাবে সেই জন্যে হয়ত।

—ছেলেটা শান্ত হয়েছে ?

ছোট্টু হাসল। আজকাল ছেলে কারু শান্ত হয়! এইত সেদিন হাত ভেঙ্গে কিছু অর্থদণ্ড করাল। একটা বিড়ি খাবেন বড়বাবু ? একটা কৌট খুলে এগিয়ে দিল ছোট্টু।

পবনবাবু না করলেন না বিড়ি বার করে ধরালেন। হাত নেড়ে ধোঁয়া সরানোর ভঙ্গি করে হাতের আড়ালে ছোট্টুর মুখ দেখে নিলেন। তোমার ছেলের স্বাস্থ্য কি রকম ? মোটা সোটা ?

ছেলেটা ওর মার ধাতের। মোটা সোটা ছিল, এখন তুরন্ত পানা বাড়িয়ে রোগা হয়েছে, অবশ্য লম্বাও হয়েছে। এক আধ বছর পর আমার মাথা পেরিয়ে যাবে, বলে ছোট্টু হাসল। দাঁড়ান ওর একটা ফটো তোলা দেখাই। ছোট্টু খুব উৎসাহে দোকানের ভেতর থেকে কাঁচি-সিগারেটের একটা বড় টিনের বাক্স নিয়ে এলো। সেটা থেকে ঘেঁটে ঘুঁটে একটা ছবি বার করল। গত বছর হাত ভেঙ্গে যখন এসেছিল তখন তুলিয়ে ছিলাম। হাতের ব্যাণ্ডেজ তখন খুলে ফেলা হয়েছে।

—বাঃ বেশ দেখতে ত তোমার ছেলে। বলে পবন নাথ ছবিটা দেখতে লাগলেন। তোমার সঙ্গে ছেলের মিল নেই দেখি। এখন নিশ্চয় অন্যরকম হয়েছে। বাচ্চারা বড় তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তন হয়।

—হ্যাঁ একটু রোগা আর লম্বা হয়েছে।

—মুখটা ত সেই রকমই আছে কি বল। মুখের পরিবর্ত্তন ত হয় না আদল একই থাকে।

ছোট্টু ছবি খানা হাতে নিয়ে বলল। মুখ সেই রকমই আছে একটু পাল্টেছে।

পবন বাবু রুমাল বার করার ছুতোয় টেপের বোতাম টিপে দিয়ে উদয়ের

ছবি বার করে ছোট্টুর মুখের সামনে ধরলেন। ধরে মুখ লক্ষ্য করলেন। একে চিনতে পার? এই ছবি খানা।
ছবিটা দেখেই ছোট্টুর মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। মৌরি চিবিয়ে নিল খানিকটা।

—না। এঁকে ত চিনতে পারছি না। কত খদ্দের ডেলি আসছে মুখ চেনা মুস্কিল।

—মুখ চেনা মুশকিল চাঁদ! ন্যাকামী রাখ এটা উদয়ের ছবি তুমি চিনতে পারছ না?

—উদয়ের অনেক স্বাস্থ্য ভাল। এ রোগা মত। উদয়দার হবে কি করে!

পবন নাথ ভেতর ভেতর খুব রেগে উঠছিলেন, মুখে এক ঝলক হাসি টেনে এনে বললেন উদয় যখন জেল হাসপাতালে ছিল সেই সময়কার ছবি থেকে রিটাচ করে ত তৈরী করা ছবি সুতরাং রোগা একটু দেখাতে পারে। রোগা আর মোটায় এত মুখ পাল্টে যায় না যে চেনা যায় না। তুমি তোমার ছেলের বেলা সেটাই স্বীকার করেছ।

ছোট্টু ঘেমে উঠল ভেতর ভেতর। মুখের মৌরি সব গিলে ফেলেছে কখন খেয়ালি নেই। গলাটা একটু শুকিয়ে এল।

পবন নাথ পকেট থেকে টেপ বার করে ব্যাগে রাখলেন। ছোট্টু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

—দুরকম কথা বললে আইন ত শুনবে না। আচ্ছা আমি চলি তুমি ভাল করে ভেবে দেখ।

—একটু চা খেয়ে যান বড় বাবু। ছোট্টু পাল্লার হুক ধরে শরীরটাকে কাত করে চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে এক কাপ চা পাঠাতে বলল।

পবন নাথ চা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ছোট্টুর আর একটা বিড়ি খেয়ে। মনে মনে হিসেব করলেন টেপটা বের করে ছোট্টু কে দেখাতে কাজটার অগ্রগতি কিরূপ হল। ছোট্টুকে জানানো হল যে তোমার সব

কথা টেপ করা রইল। দুপুর বেলা আসাতে কাজটা নির্বিবাদে করা গেল। ছোট্টুকে খেলিয়ে তুলতে পারলে ভাল কাজ দেবে।

চায়ের কাপ ছেলেটির হাত থেকে নিয়ে পবন বাবু চুক চুক করে খেয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করলেন। আসে পাশের দোকান বিকেলের জন্যে প্রস্তুতি নেবার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চান। পবন নাথকে এখানে কেউ অহেতুক চিনুক তার কোন প্রয়েজেন নেই। ছোট্টু যদিও টাফ তবে ভাইটাল পয়েন্ট। পবন নাথ মুখে প্রশান্ত হাসিটি নিলেন। তোমার দিবা নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটালাম, মনে কিছু করো না ভাই, সরকারী চাকরী, কি করব। আজকের মত চলি। ননীবাবুর কাছে আজ আর যাব না। আমি এসে ছিলাম একথা অবশ্য কারুকে বলার দরকার নেই। তোমার কোন ক্ষতি হবে না লাভ হবে বরঞ্চ। চলি।

পবননাথ ধীরে ধীরে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেলেন।

লাভ হবে।

কথাটা ছোট্টুর মনে ঘুরপাক খেল। কিসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল দারোগা-বাবু বুঝতে ছোট্টুর অসুবিধে হল না। কোন বেফাস কথা বলে ফেলেনি ত পুলিশের কাছে। মনে মনে প্রশ্নগুলো আউড়ে নিয়ে ছোট্টু মনের ভেতরে হাঁতড়ে দেখতে লাগল। হাতে ছোট্টুর ছেলের ছবিটা তখনও ধরা রয়েছে। কলে বিজন জল নিতে এসে প্রশ্ন করল। —কার ছবি রে। কি ওহো ভাবছিস।—দেখি।

—আমার ছেলের ছবি।

—উঃ, বলে বিজন চলে গেল কলের ওদিকে। ছবিটা আবার সেই বাক্স খুলে যত্ন করে রেখে ছোট্টু নিজের জায়গায় এসে বসল। মুড়ি কেনার খদ্দের এল পরপর ক'জন। তাদের বিদায় করে দিয়ে ও একটা বিড়ি ধরাতে যাবে এমন সময় চা বিস্কুটের খদ্দের এল। পাতা চায়ের দোকান এখনও খুলে নি তাই। পাতা চা নিতে খদ্দের ওর কাছে এসেছে। অন্যমনস্ক হয়ে চা ওজন করে বাকি পয়সা ফেরৎ দিয়ে ছোট্টু আবার চুপ করে বসে রইল। ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ কমে আসছে, মানুষের আনাগোনার

শব্দ বাড়ছে। একটা জাল কে যেন টেনে এনে ছোট্টুর কাছে দাঁড়াল। এবার ছোট্টুর অলক্ষ্যে ওর উপর ফেলে জড়িয়ে ফেলবে। মনে হচ্ছে একটা বিরাট জাল সবাইকে জড়িয়ে ফেলতে চায়। ছোট্টু বসে বসে ভাবছে। ননীদাকে ওই জাল জড়িয়ে ফেলতে চায়।—কেন? কেন না উদয়কে ননীদত্ত আশ্রয় দিয়ে অপরাধ করেছে। উদয় কিংবা উদয়ন যার এই ছবি সে বহরমপুর জেল টপকে পালিয়ে ছিল। ইশ্ ননীদা আজ কি দোকানে আসবে না। ছোট্টু অবশ্য ননীদার বাড়ি খেতে যাবে। খেতে যখন যাবে, সে ত অনেক পরের কথা। ননীবাবুর এমনই ছাড়া ছাড়া ভাব কিছুতেই গা নেই। দারোগাবাবু এসেছিলেন, কি কথাবার্তা হল সে সমস্ত ত জানাতে হবে। এ জাল বিস্তারের কথা ভেবে ছোট্টুর ভয় হচ্ছে। ননীদার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ননীদার বিপদ মানে ছোট্টুরও বিপদ।

হ্যাঁরে ছোট্টু তুই নাকি তোর ছেলের ছবি হাতে করে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছিস। কিছু হয়েছে? খবর পেয়েছিস?

ছোট্টু হাসল। অনন্তদা এসে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়েছেন।

না না আমার ছেলের কিছু হয়নি। আপনি চেয়ারটায় বসুন খদ্দেরকে খাবার সোডাটা দিয়ে দি।

খদ্দের বিদেয় করে ছোট্টু বলল, দুপুরে আমার কাছে পুলিশের লোক এসেছিল। একটু চা বলি।

অনন্তদা চেয়ারের উপর বসল। তা বল। কিন্তু এত বড় ভাবনার কথা। পুলিশে তোমার কাছেও ঢু মারছে। কি জিগ্যেস করছিলো?

—কি চাই।

—চিমনি।

ছোট্টু খদ্দেরকে হ্যারিকেনের চিমনি দেখিয়ে জিগ্যেস করল এই সাইজ।

না ওরকম নয়। বড়টা।

খদ্দের চলে যেতে ছোট্টু বলল, আমি যখন ভর দুপুরে গাটা একটু টান করে ঘুমিয়েছি ঠিক সেই সময় লোকটা এল।

তারপর যা যা কথাবার্তা হয়েছিল ছোট্টু সমস্ত অনন্তদাকে বলে গেল।

এর মধ্যে চা দিয়ে গেল বিজু। ছবিটা উদয়ের ছিলো ? তুই ঠিক চিনেছিস ?

হ্যাঁ, আমার ভুল হয়নি।

একটু চা ছলকে অনন্তদার কাপড়ে পড়ল। সর্বনাশ। ছবি পেলে কোথা থেকে ? পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা ! খুব সাবধানে যে উত্তর দিয়েছিস তোর বাহাদুরী আছে। বাবুর ক্ষতি করবে না ?

সুযোগ যখন পেয়েছে তখন চেষ্টা ত করবে। কিন্তু আশ্চর্য এ ব্যাপারে পুলিশের যেন একটু বেশী মাথা ব্যথা।

—বোধহয় যার মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে তাদের টাকা আছে।

—পাগল নাকি ! তারা কিছু বলে নি। পুলিশ কেস হচ্ছে।

—ছবিটা একটু আবছা ঠিক ক্যামেরায় তোলা ফটোর মত নয়। বুঝলে।

—তা হোক। ছবিটা ত উদয়নের, জোগাড়ে আছে। এরা উদয়কে ধরতে না পারা পর্যন্ত যাকে পাবে তাকে ধরে টানাটানি করবে। তুমি বলেছ ত' চেন না।—ব্যস। চায়ের গেলাস ঠকস করে নামিয়ে অনন্তদা উঠে পড়লেন। আর বসব না। মেজটা আজ আসবে না। ননীবাবু এলে আমায় খবর দিস।

কিছুক্ষণেই ননীদা এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে ছোট্টু আর ননীদত্ত চলে গেলেন। অনেক রাতে ছোট্টু দোকানে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

১১

উপরওয়ালাদের চাপে অনেকে বিরক্ত হয়ে উঠল। অপরাধ প্রমাণ করার জন্যে এই সাক্ষী যোগাড় কর, সই স্বাক্ষর নাম ধাম জোগাড় কর, এটা সেটা কর। অত কিসের দরকার। উদয়ন জেল ভেঙ্গে পালিয়েছিল এবং তাকে ননীদত্ত নামক এক দোকানদার স্থান দিয়েছিল সেই অপরাধে তাকে জেলে পুরে ফেল। সোজা বাংলা কথা ফাটক কে অন্দর ভর দেও।

—না না তা বললে চলবে না। দেখতে হবে ননীদত্ত জেনে শুনে এ কাজ করেছে কিনা। মানে দেখাতে হবে—যে সে সব জানত। কারণ দেশে

আইন আছে। বিচার আছে। গণতন্ত্র আছে। এসব অমান্য করে ত' কিছু করা উচিৎ নয়।

রায় সাহেব ঘোরানো চেয়ারে বসে স্থির হয়ে ফাইল দেখতে দেখতে পায়ের চাপে চেয়ারটা একটু ডান দিকে ঘোরালেন। ডান হাতে চুরুটটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে বাঁ হাতে ধরে টেবিলের উপর অ্যাসট্রের খাঁজে রেখে কথা বললেন। ২৬শে এপ্রিলের কেস। ননীদত্তর ওই ডেটের কিছু পারচেজ ভাউচার দোকানে পাওয়া গেছে ?

একজন একটা খোলা ফাইল এগিয়ে দিল। —এই যে স্যার।

চুরুটের ধোঁয়া ঘরে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠছে। উদয়ের ফটোটা আমরা রিটাচ্ করে কেমন করেছি দেখুন স্যার। মিস্টার সোম দুটো ছবি রায় সায়েবের দিকে এগিয়ে দিলেন। দ্যাট্ চ্যাপ, বড় বাজারের যে দোকানটায় সেদিন মাল কিনেছিল তার রিপোর্টটাও দেখব।

—রেডি আছে।

—হ্যাঁ। বেশ ভাল হয়েছে। একই লোকের মুখ। রোগা আর মোটা। রায় সায়েবের মুখে প্রশান্তি। এই ছবিটা বড় বাজারের ওই কর্মচারীকে দেখানো হলে কি বলে দেখ। কি নাম যেন। কর্মচারীটার ?

—বুলাকীরাম।

—বুলাকী, লাকি হতে পারে। ট্রাই।

সোম সায়েব মুচকি হাসলেন।—ওকে নিয়ে একটু অসুবিধে হচ্ছে। যে যে সময় বুলাকী একা বসে দোকানে ঝিময়, সে সময়গুলো বেয়াড়া।

—কি রকম ?

—ভোরবেলা দোকান খুলে গণেশজীকে ধুপ কাঠি ঘুরিয়ে বস্তার উপর বসে ঝিময় যতক্ষণ লালাজী না আসেন। আর রাত্রে লালাজী যখন হিসেব করেন দোকানের একটা পাল্লা টেনে দিয়ে তখন ও ঢোলে। সঙ্গে অবতার এক একদিন থাকে। কথাগুলো একজন সাবইন্সপেক্টার বললেন।

মিস্টার কুশারীর মেয়ে বাচ্চা তাই ওর কথাগুলোর মুল্য আইনে কাউন্ট করবে না।

—এইটা একটা পয়েন্ট। রায় সায়েব চুরটের ধোঁয়া ছেড়ে কথাগুলো বললেন। পবনবাবুর রিপোর্টটা দেখেছেন মিস্টার ধর।

—কোন রিপোর্ট স্যার?

—কি নাম যেন?

—ছোট্টু।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-ছোট্টু।

—দেখছি স্যার। সেভেন্টি পয়েন্ট নেগেটিভ।

—পজেটিভ করবেন ত' আপনারা। এফ, আর কি বলে?

—বুলেট টায়ারে ঢুকেছিল, পাওয়া গেছে?

—রিপোর্ট? রিপোর্ট, ফরেনসিক ডিটি হাই।

—দেখবেন মিস্টার ধর সব গুছিয়ে জাল টানবেন।

—হিয়ারিং যেন শেষ হয় ঠিক মত। সাক্ষী-সাবুদ সব রেডি করে সময় নেবেন।

রায় সায়েব ইশারা করতে সবাই বেরিয়ে গেল। বসে রইলেন সোম সায়েব।

নিদেন ননীদত্তকে জেলে পুরতে না পারলে সম্মান বজায় থাকে না। পবনবাবু এলে পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা একটা কথা, ননীদত্তর পাশের দোকানের একটা কর্মচারী ছবিটা দেখেই ত চিনতে পেরেছিল যে উদয়ন। তাহলে? কান টানলে মাথা আসবে। ননীদত্তকে জেলে পুরে দেখা যাক রেজাল্ট।

মিষ্টার সোম বললেন, আমি কাজে বেরুচ্ছি স্যার? পবনবাবু আজ বড় বাজারের কাজটা সেরে ফেলবেন।

মিষ্টার রায় প্রশ্নবাচক ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন। আচ্ছা!

মিষ্টার সোম একটু হাসলেন, মিষ্টি খায় কি খায় না। মনে আছে?

—হ্যাঁ বহরমপুর জেল থেকে সব ডিটেল গিয়ে তুমি দেখে এলে তাই কাজ একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। চুরটে টান দিলেন মিষ্টার রায়। মিষ্টার কুশারীর মেয়ে বলেছিল কাকু শুধু সিঙ্গাড়া খেয়েছিল। ওইটুকুই আমাদের স্ট্রাইক করেছিল।—না

মিস্টার সোম সিগারেটের শেষ অংশ ট্রেতে গুঁজে উঠে পড়লেন।— বিশুয়াকে কন্‌ট্যাক্ট করতে আমি নোট দিয়ে যাচ্ছি।

মিস্টার রায় তাকালেন।—বিশুয়া!

—হ্যাঁ ওযে আমাদের ভাইটাল সাক্ষী—ট্যাক্সী ড্রাইভার। যার গাড়ি করে উদয়ন ফলো করেছিল মিস্টার কুশারীর গাড়িটা।

—আই সী—বিশুয়া! ঠিক ঠিক। মিস্টার রায় হাসলেন। ওই চলন্ত ট্যাক্সী থেকে উদয়ন রিভলভার দিয়ে টায়ারে গুলি করেছিল। আই সী। লোকটা ত' বদ, নাকি নেশা ছেড়ে দিয়েছে!

—পয়সা পেলে আবার করবে। মিস্টার সোম হাসলেন।

—আগাম কিছু দিয়েছ?

—হ্যাঁ দিয়েছি স্যার।—বদ্রি।

—জী।

—গাড়িতে সার্ট দিয়ে রাখ।

—আমরা তাহলে চার তিনে গোল ঘরে মিট করছি।

—আর কিছু বলার নেই—তাই ত'।

—না। আমি চলি।

মিস্টার সোম বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর পবন বাবু এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

মিস্টার রায় ফাইল থেকে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ইশারা করলেন এগিয়ে যেতে। দু'চারটে কথা হল। পবনবাবু ঘাড় নেড়ে নেড়ে সম্মতি জানালেন।

মিস্টার রায় একটা কাগজে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পবনবাবু ঝুঁকে দেখে আবার মিস্টার ধরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর লিখতে লিখতেই মিঃ ধর প্রশ্ন করলেন, ঠিক আছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—যান তাহালে। রাত্রের মধ্যে আমি জানতে চাইব।

—ঠিক আছে, বলে পবনবাবু বেরিয়ে এসে রুমাল বের করে মুখ

মুছলেন। মনে মনে ঠিক করে নিলেন প্রথম বিশুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবেন। বিশুকে এসময় কোথায় পাওয়া যেতে পারে, বাড়ি !—না বাড়িতে ও ঢুকবে না পাছে বুধিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। হয়ত ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে কাছাকাছি ওই চায়ের দোকানে বসে রাজা উজির মারছে। এ সময় বিশু চায়ের দোকানেই বেশির ভাগ আসে।

অবশ্য অন্য লাইনের প্যাসেঞ্জারের পাল্লায় পড়লে আর আসা হয় না।

ওখান থেকে বেরিয়ে বিশুর অপেক্ষায় পবন নাথ ওই দোকানটায় অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

দোকানের ছেলেটাকে জিগ্যেস করেছিলেন বিশু চা খেতে এসেছিল? ওরা বলেছে দেখি নি।

পবনবাবু সাধারণ লোক হিসেবে বিশুকে খোঁজ করার অজুহাতে বলেছিলেন যে একটা বর-কনে যাত্রী নিয়ে যাবার ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

কথাটা ওই ছোকরা শঙ্কর যে কনডাক্টারী ট্রেনিং নেয় আর বাস ট্যাক্সী মোছে ওই শুনেছিল। ও ট্যাক্সী ড্রাইভার গোবিন্দ চা খেতে এলে ওকে চুপি-চুপি বলছিল বিশুয়াকে খুঁজতে এসেছে পুলিশের লোক। বলছে বর নিয়ে যাবার জন্যে বিশুর সঙ্গে কনটাক করতে এসেছে, তুই বাত করে কনটাক করে নে। বলে হাসছিল শঙ্কর।

গোবিন্দ শঙ্করের হাতটা মুচড়ে ধরল। বা বড়া হিরো বন গিয়া—ও লাইন বিশুয়া কা হ্যায়। উসব পুলিসি বাত মে হমকো কভি ফাঁসতে দেখা। বিশুয়াকে সাক্ষী মেনেছে ওই, কেসে তাই বাত করতে এসেছে—বুঝলি। পুলিশের বর ত' বিশু। গোবিন্দ আড় চোখে পবননাথের দিকে তাকিয়ে নিল।

পবনবাবু বুঝছিলেন চায়ের দোকানে তিনি চা খেতে আসায় স্বাভাবিক অবস্থা নেই। ওঁকে নিয়ে যে ফিসফাস হচ্ছে তা বুঝতে পারছিলেন, উঠে চায়ের দাম মিটিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

গোবিন্দ হেসে উঠল, বিশুর শ্বশুর চলে গেল।

জামাইয়ের পাত্তা মিলতে দেরি আছে। তুই বসিরহাট গিয়ে সব ভুলে গেলি শঙ্কর!

শঙ্কর হাতে হাত বুলোতে লাগল। হাতে জোর আছে জয়গোবিন্দের দেখছি।—না ভাল লাগল না বসিরহাটে,—চলে এলাম। মার অসুখ, টাকা কড়ির ধান্দা করতে হবে। বাবা সাইকেল সারায়ের দোকান থেকে যা পায় বাইরে খরচা করে বাড়ি ফেরে। আমাকে ডবল ধান্দা করতে হবে।

—চলে এলাম।

—সাক্ষী হলে বিশু হেভি পয়সা পাবে বুঝলি।

—তাই! শঙ্কর তাকাল।

গোবিন্দ চা খেতে লাগল। তবে কি এমনি! কিন্তু ওই লোকটা ত ভাল কাজ করল, দুজন গুণ্ডার হাত থেকে ওই বাচ্চাটা বাঁচিয়ে ওর মা বাপের কাছে ফেরৎ দিয়ে এল।

—তাতে কি হল, শঙ্কর গোবিন্দের দিকে তাকাল। এটা আমরা আগেই শুনেছি ও ওই মেয়েটার বাবার কাছে হেভি মাল খিঁচেছে। বিশুয়া বলেছিল।

—চুপ কর বোকা-বক্‌রা। একটা পয়সা ওই লোকটা নেয় নি। মেয়েটাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চুপচাপ বেপাত্তা হয়ে গেছে। শালা পুলিশ ওকে খুঁজছে। ধপ করে গেলাসটা গোবিন্দ বেঞ্চির ওপর রেখে উঠে পড়ল। চলতা বেটা; ফির মিলেঙ্গে। শঙ্কর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। গোবিন্দর ট্যাকসীর স্টার্টের শব্দ হল, তারপর পেট্রোলের গন্ধ এসে চায়ের দোকানটায় ঢুকল।

দুচার জন, পুলিশ সম্বন্ধে মন্তব্য করে, যে যার কাজে চলে গেল।

রাত্রে বিশু খেতে এল। বহুদিন পর হাতে বোতল নিয়ে বিশুকে ঢুকতে দেখে অনেকে অবাক হল। কিছুক্ষণ পর শঙ্কর এসে বসল। ভাঁটিখানায় গিয়েছিল একজনকে ধরতে, যদি গোটা পাঁচেক টাকা আদায় পাওয়া যায়। বসিরহাটে তাড়াতাড়িতে চলে গিয়েছিল, সেই সময় খুচরা নেই বলে ডিপোর মালিক টাকা দেয় নি। সেটা যদি পাওয়া যায় সেই জন্যে

গিয়েছিল। শঙ্কর আজ চা রুটি খেয়ে কাটিয়ে নিয়েছে রাত্রের খাওয়া। তাকিয়ে দেখল, বিশু তড়কা মাংস পিঁয়াজ রুটি নিয়ে খেতে বসল।

কোথাও ভাল ধান্দা হয়েছে বিশুর। মন মেজাজ খুব খুশি আছে। একটা মাংসের টুকরো বেঞ্চের নীচের কুকুরটাকে ছুড়ে দিল। কুকুরটা মহা আনন্দে সামনের দুপায়ে মাংসর টুকরোটা চেপে ধরে খেতে লাগল। শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বিশু বলল, আরে তোর জামার এ হালত হল কি করে। শঙ্কর নিজের জামাটার দিকে তাকিয়ে নিল তারপর হাসল। টপিন রোডের কাছে তেওয়ারী একটা প্রাইভেটকে ধাক্কা মেরেছে সেখানে একটু ঝামেলা হল।

—তোদের ধোলাই হল নাকি। বিশু হাসল।

—না আমি ত ভিড়ে মিশে গিয়েছিলাম। পুলিশ লম্বর লিয়ে নিল। প্রাইভেটের বেশি লাগে নি, দরজাটা খুলছিল না আমি ঠিক করে দিলাম। ও, শ্লা গাড়ির মালিক ত ভয়ে অস্থির। কিছুই চোট লাগে নি। গাড়ির নীচে ঢুকে ছিলাম তাই মোবিল লেগেছে।

—বরবাদ। বিশু বোতল উপুড় করে মুখটা বিকৃত করল।

শঙ্কর বলল, তুই তোর বরবাদীর কথা বলছিস ?

—তোর জামাটার। বিশু হো হো করে হেসে ফেলল। বেটা ধোলাই নিশ্চয় খেয়েছিস। তেওয়ারীকে বলিস গাঁজা খেয়ে বাস যেন না চালায়। কোন দিন পাসিঞ্জারদের জান শেষ করবে বিটি রোডের গড্ঢায়।

হঠাৎ কুকুরটা ছুটে বেরিয়ে গেল। শঙ্কর বলল বেটা নিশ্চয় অন্য কুকুরকে ওর এরিয়ায় ঢুকতে দেখেছে। নজর আছে খুব।

বোতলটা বিশু নিচে নামিয়ে উঠে পড়ল। শঙ্কর বলল, বিশু দশটা টাকা হবে—আজও মাধব বাবুকে পাত্তা করতে পারলাম না।

—না, হারামের টাকা আছে ? বিশুর চোখগুলো লাল হয়ে উঠেছে। এগিয়ে এসে শঙ্কর কাছে দাঁড়াল। —কাল বসিরহাট যাব ভাবছি।

বিশু হাসল, বারাসাত ত ডেলি ট্রিপ মারছিস ওখান থেকে বসিরহাট যেতে আবার খরচা লাগে ?

—বাড়ি গেলে লাগবে না ! মা বোধ হয় বাঁচবে না। —হবে টাকা ?

আমি তু এক টাকা করে চুক্তি করে দেব। শঙ্কর হেসে তাকিয়ে রইল বিশুর মুখের দিকে।

—আগাম টাকা কিছু পেয়েছি ও লোকটার কাছে। কাজের আগে খিঁচে না নিলে পরে পস্তাতে হবে।

—কার কাছে? পুলিশের কাছে?

—হ্যারে তবে না ত কি। সাক্ষী ঠিক মত দিতে না পারলে জান খতরে মে।

—তুমি কি সাক্ষী দেবে?

—যে লোকটা আমার ট্যাকসী থেকে গুলি ছুড়েছিল তার ছবিটা কোর্টে চিনতে হবে। বিশু গম্ভীর হয়ে শঙ্করের দিকে তাকাল। তোর অত খোঁজের দরকার কি হাতটা ধুয়ে নি দাঁড়া।

—ওই লোকটার ছবি তুমি চিনিয়ে দেবে! বেইমানী করবে? শঙ্কর যেন অবাক হল।

ফচ্ করে মুখ থেকে জল ফেলে বিশু বাঁ হাত দিয়ে আলতো করে ডান পকেট থেকে টেনে রুমাল বার করল। কি বললি, বেইমানী?

শঙ্কর বলল, তুমি জান ওই লোকটা মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি চলে গেছে। কারুর সঙ্গে দেখাও করে নি, একটা পয়সা নেয় নি।

—বাজে কথা।

—গোবিন্দ বাজে কথা বললে? —খবরে বেরিয়েছিল তাছাড়া।

—শঙ্কর বেটা তুমি বড় বক বক কর। আমি কার সঙ্গে বেইমানী করলাম? একটা ছবি চিনি বলতে হবে. হ্যাঁ এই লোকটা আমার ট্যাক্সী থেকে সামনের ফিয়েটে গুলি করেছিল ব্যস আমার ছুটি। ও মেয়ে ফেরৎ দিয়ে টাকা নেয় নি বা নিয়েছে আমার দরকার নেই জানবার। আমি জানব কত মাল পেলাম।—নে দশটাকা রাখ।

—টাকাটা দরকার দাও। শঙ্কর হাত বাড়িয়ে নিল। বিশু হাত সরিয়ে নিল, উঃ টাকার বেলা হাত খুব লম্বা হয় না?

—শঙ্কর হাসল, এটাকা যেমন করে পারি ফেরৎ দিয়ে দেব।

—নে ধর। পারলে দিবি। বিশু শঙ্করের হাতে টাকা দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে বেঞ্চের নীচে কুকুরটার গায়ে পা লাগল।—বেটা এবার অন্য মালদার পার্টি ধর পেটটা ভরবে।

—ওর পেট আমাদের মত পেলে ভরবে না পেলে কোই বাত নেই। শঙ্কর দাঁত বার করে হাসল। বিশু কি ভেবে দাঁড়াল। —তাজ্জুব আদমি! ও একটা পয়সা নেয় নি মেয়ের বাপের কাছে!

—পুলিশ ওকে ধরেছে? শঙ্কর জিগ্যেস করল।

—না। একটা মুদিকে ফাঁসাবে বলে পুলিশ কেসে জড়িয়েছে। চলি আর ভাল লাগে না। ওই মুদির দোকানে নাকি ও কাজ করত। লা সবই তাজ্জুব। বিশু ধীরে ধীরে চলে গেল।

শঙ্কর চিৎকার করে প্রশ্ন করেছিল, লোকটা কে তাহলে?

বিশু জবাব না দিয়েই চলে গেল। হয়ত শুনতে পায় নি।

১২

এ বাজারের উপর দিয়ে যেন কিছুদিন আগে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল যদিও ঝড়ের মুখে সরাসরি পড়েছিলেন ননীদত্ত তবু অনেকেই ভীত এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল, কি হয়।

ননীদত্ত এখন স্বাভাবিক ভাবে দোকানে আসেন বসেন এবং সময় মত চলে যান। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যান। সেটা ছোট্টু লক্ষ্য করে। ননীদত্তর জেল হবার কথা ছিল কিন্তু হয় নি। জেল হয় নি তাই বাবুর আর ত কিছু চিন্তার থাকতে পারে না তবু কেন অন্য মনস্ক হয় ছোট্টু বুঝতে পারে না। উদয়দার জন্যে খালি খালি লাগে। কেউ উদয়দার কথা বললে ও খুশি হয়, খোঁজ নিলে আনন্দ হয়। কিন্তু ও কে তা কোন দিন ননীদা বলতে পারেন নি। বলতে পারলে যেন আরও খুশি হতেন।

বাজার আগের মতই স্বাভাবিক চলছে। সেই ভোর বেলা দুধের গাড়ি আসে। মাছের ঝুড়ি ফেলার শব্দ। কাকের ডাক। তারপর ক্রেট ফেলার শব্দ ঝন ঝন। চলছে সবই ঠিকঠাক। শুধু গোজুর ফলের দোকানটা

বন্ধ। অনন্তদার দোকানের নীচে খুপরী, মেঝের নীচের ঘরে গোজুর ফলের দোকান। দোকান সাজিয়ে বাইরে বসত গোজু মিয়াঁ। সে প্রায় মাস দুয়েক দোকান বন্ধ করে হাওয়া হয়েছে। ওই ঝড় ওকে স্পর্শ করেছিল তাই গোজুর দোকান বন্ধ। বে মৌকা ভুল করে বসেছিল গোজু যেটা পবননাথ ছোট্টুকে দিয়ে করাতে পারেন নি। হঠাৎ একদিন পবননাথ গোজুর অসতর্ক মুহূর্তে—ওর সামনে উদয়ের ছবি মেলে ধরে প্রশ্ন করে ছিলেন এই উদয় ননীবাবুর দোকানে কত দিন কাজ করছে, মানে কত দিন থেকে একে তুমি দেখছ? তুমি ত জান উদয় ফেরার হয়েছে তুমি বাজারে বস তোমরা যদি পুলিশকে সাহায্য না কর তাহলে পুলিশ অন্য রাস্তা নিতে বাধ্য হবে। গোজু একটু ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিয়েছিল, হুজুর ওকে আমি ওই দুকানে দেখেছি লেকিন কবে থেকে এল সে খবর আমি কি করে দেব।

—কেন দিতে পারবে না? পবন নাথ প্রশ্ন করে ছিলেন ওর ভয়ার্ত মুখের সামনে ছবিটা মেলে ধরে। একে কি তুমি চিনতে পারছ না নাকি?

—হ্যাঁ হুজুর পহচানবো না কেন! আমার বাবা হ'লে বলে দিত ও কত দিন ননীদার দুকানে কাম করতেছিল। কিন্তু বাবাটা ত পাগলা মত হয়ে ঘরে থাকে।

ওই টুকুই পবন নাথের জানার দরকার ছিল তাই তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। শুধু গোজুকে বলেছিল যদি দরকার হয় আমি খবর দেব।

অনন্তবাবু আসতে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা গোজু ওঁকে জানিয়েছিল। তারপর গোজু অনন্তবাবু ননীদা আর ছোট্টু চার জন মিলে পরামর্শ করে স্থির করেছিল কিছুদিন গোজু গা ঢাকা দিয়ে থাক। গোজুও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝেছিল এবং নিজে ছবিটাকে উদয়ের ছবি হিসেবে চিনে যে মারত্মক ভুল করেছিল সেটা বুঝতে পেরেছিল। গোজু বলেছিল আমি যাব কোথায়! পরে নিজেই ঠিক করেছিল বাংলাদেশে কিছুদিন ও জিজাজীর (জামাইবাবুর) কাছে গিয়ে থেকে আসবে। কিছু দিনে ঝামেলা মিটে গেলে আবার এসে দোকান লাগাবে।

ওর বন্ধ দোকানের খাঁজে একটা কুকুর বাচ্চা দিয়েছে তিন চারটে।

অনন্তদা মাঝে মধ্যে হেই হেই করে চিৎকার করেন। সেদিন এক খোদ্দেরকে তেড়ে এসেছিল কুকুরটা।

এতদিন হয়ে গেল জিজাজীর আদর খেয়ে গোজু ফিরল না,ও ফিরে দোকান খুললে কুকুরটাকে তাড়ানো যায়। অনন্তদা অনুমান করেছিলেন
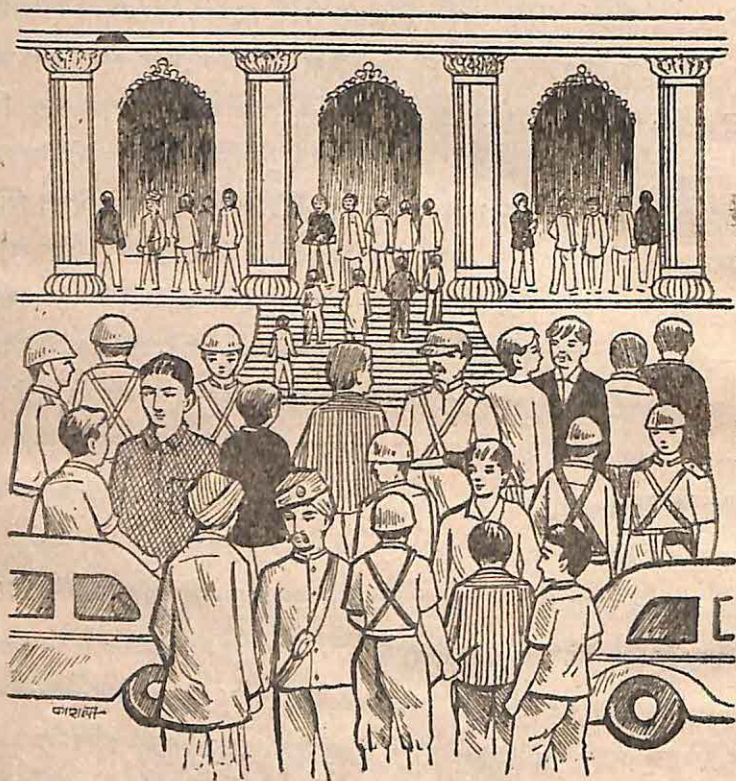
কয়েক দিন পুলিশ গোজুর খোঁজ করে গিয়েছে। এখন কি আর খোঁজ করবে!—পুলিশই জানে।

পুলিশ বড়বাজারে বুলাকি রামের বক্তব্য টেপ করে ছিল। বুলাকি বলেছিল তসবির দেখে মালুম হয় না। যে বাবু সওদা করেছিলেন তাঁকে লিয়ে আসুন।

পরে বুলাকি রামকে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল।

পর পর সাক্ষী তুলেছিল পুলিশ। ননীদত্তর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল যতই কেস এগুচ্ছিল। ভাইটাল সাক্ষী বিশুকে ত এখনও নেওয়া হয় নি।

কি কি মাল সেদিন বড় বাজারে উদয় খরিদ করেছিল সে লিস্টও মেলানো হল কোর্টে। ননীদত্ত কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠছিলেন। বাইরের থেকে ছোট্টু উঁকি মারছিল এবং জজের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ননীদত্ত জেল ভঙ্গকারীকে আশ্রয় দিয়ে ভীষণ অপরাধ করেছেন।

সেদিনের কথা মনে পড়তে ছোট্টু কি জানি কেন খুক খুক করে হেসে উঠল। পুলিশের ঝামেলা, কোর্টের ঝামেলা মিটে যাওয়াতে ছোট্টু খুব আনন্দিত। মাঝে-সাঝে বিকেলের দিকে চা আনিয়ে বসে বসে খায়। আজ চা খেতে খেতে সেদিনের দৃশ্য মনে পড়তে ওর হাসি পেল। হাসতে গিয়ে বিষম খেল। কিছুক্ষণ আগে গোজু এসেছিল আগেও দু' একবার গোজু এসে হাওয়া বুঝে গিয়েছিল।

ছোল্লু বলেছিল তোমার আর ভয় পাবার কারণ নেই চিড়িয়া উড় গিয়া। দোকান খুলে কারবার চালু করে দাও।

গোজু জিগ্যেস করেছিল কেস প্রমাণ হল না কেন? ওদের এত ক্ষমতা তাছাড়া সেই ট্যাক্সী ড্রাইভার যে আসল সাক্ষী তার জবানীই ত' আসলি। ছোট্টুকে বিরক্ত করছিল গোজু, যখন ও ঠিক দিবানিদ্রা শেষ কোরে উঠে বসেছে। চা বিস্কুট আনিয়ে গোজু খাওয়ালো। বলল, পুঁজি শেষ হয়ে যাচ্ছে, দোকান এবার ওকে খুলতেই হবে। গোজু নিশ্চিন্ত হতে চাইছিল ননীদত্তর কিছু হল না কি ভাবে।

দু'চার বার খুক্ খুক্ করে হেসে নিয়ে শেষ শুনানীর দিনের ঘটনাটা ছোট্টু শোনাল।—সেদিন কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে বাবু ঘামছে, যখন বুলাকি-রামের সাক্ষী নেওয়া হচ্ছিল। তার আগে ত আমার বুক কেঁপে উঠেছিল যখন বুড়ো একটা লোক ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করে বাবুর নাম ধরে ডাকল, আসামী হাজির। বাবু কাঠ গড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে আমার খুব খারাপ লাগল। উদয়দার ওপর ভীষণ রাগ হল, বাবুর তোমার জন্যে এই দশা হল...। যাক তারপর ছবি বেরুল। বুড়ি কি বলেছে তার টেপ বার করা

হল। অবশ্য জজসায়েব সেটা বাজাতে বলেন নি। লেখা দেখলেন। মিস্টার কুশারীও এসেছিলেন সঙ্গে বুড়ি ছিল। কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস্টার কুশারী এবং একটা দুটো প্রশ্নের জবাব দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে ছিলেন তখন আমি বাইরে দাঁড়িয়ে। দুশ্চিন্তায় মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রয়েছি কি হবে। এমন সময় কানে এল এখনও ত' বিশু ট্যাক্সী ড্রাইভার এল না। অনেক পদস্থ পুলিশের অফিসার এসেছিলেন। ছুটাছুটি আরম্ভ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের জন্যে শুনানী মুলতুবী হয়ে রইল। জজসায়েব লাল ঘেরার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বাইরে পুলিশদের চিৎকার গালমন্দ আরম্ভ হল। বিশু কোথায়! পবনবাবু কোথায়। জজসায়েব আধঘন্টা বিশ্রামের পর আবার বিচারে বসবেন। এ সময়ের মধ্যে বিশু না এলে ওকে তৈরী করে নিতে না পারলে আজকের দিনটা নষ্ট হবে। তাছাড়া এটা ছেলে খেলা নয়। সাড়ে দশটায় পবনবাবুর আসার কথা, দুটো বাজতে চলেছে। একজন সাব ইন্সপেক্টার ছুটে বেরিয়ে গেল ছোট্টুর পাশ দিয়ে।

একটা ট্যাক্সী এসে দাঁড়াল কোর্ট ঘরের বারান্দার নীচে। ছোট্টু পবন-নাথকে চিনতে পারল, ওই লোকটা ওকে ছবি দেখাতে গিয়েছিল কিন্তু বিশুকে চিনতে পারল না।

একজন হোমড়া চোমড়া পুলিশের লোকই হবে বলে উঠল, এত দেরী হল আপনাদের!

—সারা কলকাতা খুজে বিশুকে ধরে নিয়ে আসতে হল। ও মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়েছিল খুঁজে খুঁজে তুলে আনলাম। সময় আছে? পবননাথ উপরে উঠে এলেন।

—এরকম মাতালকে কাঠ গড়ায় সাক্ষী হিসেবে দাড় করানো যায়! আপনি পুরোনো লোক হয়ে সব ভুলে যাচ্ছেন। অফিসারটা পবন বাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—ওকে এক পেট নুন জল খাইয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করিয়ে

আমি ঠিক ব্যবস্থা করে দেব স্যার। পবন নাথ বললেন।

—ওর মত লোককে কাল রাতটুকু থানায় রাখলে বুদ্ধিমানের কাজ হত বুঝলেন পবন বাবু, তাহলে আজ অসুবিধায় পড়তে হত না।

পবনবাবু তুজন সিপাহীকে ফিসফিস করে কি বলতে একজন বড় এক গেলাস জল নিয়ে এল।

জল মুখে দিয়ে বিশু গেলাস ছুড়ে ফেলে দিয়ে গোল মাল বাঁধল। কি সব গাল মন্দ দিল সিপাইরা। অফিসার গিয়ে বিশুকে এক লাথি কসে দিলেন।—নেশা করে সাক্ষী দেওয়া! এঁ্যা।

—হ্যাঁ আমি নেশা করে সাক্ষী দিতাম—মিলিয়ে নিন—যা শিখিয়েছেন উকিল বাবু, দারোগা বাবু তার একচুল এদিক সেদিক হবে না। পয়সা খরচ করে নেশা করেছি।

তারপর বিশুকে আড়ালে নিয়ে যাওয়া হল এবং শেষে সাক্ষী অসুস্থ বলে আর একটা দিন সময় নিল পুলিশ। পরে আসবার সময় দেখলাম বিশু বসে আছে আর পবনবাবু কি সব বোঝাচ্ছেন।

ছোট্টুর কানে এল পবনবাবু বলছেন। অতবড় অফিসার লাথি মেরেছেন ত' কি হয়েছে। চল তোমায় বাড়ি দিয়ে আসি। অন্য দিনের যে ডেট পড়েছে আমি আগে ভাগে তোমায় জানিয়ে দেব।

বিশু বলছিল, আমি বসে একটু হাওয়া খাই আপনারা যান। আমি পরে ট্যাক্সী নিয়ে চলে যাব। ননীদার দিকে তাকিয়ে দেখল বিশু।

আমরা চলে এলাম আর কিছু জানতাম না। পরের ডেটে বুক ধড়ফড় করতে করতে আমরা আদালতে গেলাম। জজ ব্যারিস্টার কৌসুলী পুলিস ফাইল পেশকার ডেমিস্ট্যাম্প সব রেডি। সব রেডি। সব সাইজ করা শুধু বিশু এল না বলে খুক্ খুক্ করে ছোট্টু হেসে উঠেছিল।

সব আটঘাট বেঁধে জাল টানা হল, শেষ শুনানী শুরু হবে। বড় মাছটা ঝপাং—পুকুরে লাফ মেরে পালাল।—উঃ

রক্ষে করেছে বিশু, না হলে বাবুকে শ্রীঘরে ঢুকতে হত। খুক্ খুক্ করে আবার হেসেছিল ছোট্টু।

বিশু এল না কেন। ননীদত্তর মনে বহুদিন কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল বিশু সাক্ষী দিল না কেন। শুনেছিলেন বিশু হাসপাতালে। ভীষণ মার খেয়ে হাত ভেঙে গিয়েছিল তাই হাসপাতালে পড়েছিল কিছুদিন। তার আগে হাজতে কিছুদিন ছিল।

গোজু একদিন ননীদাকে বলল, বিশুর খবর পেলাম। দত্তপুকুরে আম আনতে মাঝে মাঝে বাসে যাই আমি আর সফিক ভাই।—ওর মাছুয়ায় বড় দোকান। সফিক ভাই খুব মস্ত আদমি, বাসে একটা ছোকরার সঙ্গে বেশ দোস্তি জমানো আছে। ওই লাইনে হরদম আসা যাওয়া আছে ত। ছেলেটার নাম শংকর। কথায় কথায় সেদিন ও বিশুর নাম তুলল ওই শালা চুঙ্গি ঘরের বাত উঠতে কথাটা এসে গেল।

ননীদা এবং ছোট্টু দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন গোজুর কথা শুনে। কি হল? বল।

—বিশু ট্যাক্সী ড্রেভার—একটা সাক্ষী দেয় নি বলে মার দিয়ে হাত ভেঙ্গে দিয়েছে বলতেই আমি বুঝে গেলাম, কার কথা! কার কথা! বিশু? হাঁ হাঁ বোল? তারপর অনেক কথা শুনলাম। ও সাক্ষী দেব না বলেই সেদিন লুকিয়েছিল। তারপর বোতল তিনচার খেয়ে বেশামাল হয়ে আদালতে হাজির হল যাতে সাক্‌খী দিতে না হয়। ও পুলিশকে বলেছিল ওই ফোটো মানব যদি এটার ফিলিমটা দেখান যেটা থেকে ফোটু ছাপা হয়েছে। পুলিশ ওকে বেদম মার মেরে ছিল কিন্তু কবুল করতে পারে নি। বিশু শুধু বলেছে—ও লোকের সঙ্গে বেইমানী করতে পারব না। ওর সঙ্গে বেইমানী করা আর নিজের মায়ের সঙ্গে বেইমানী করা এক। দুনিয়ার নজরে আমি খারাপ—কিন্তু আমি বেইমান না।

—তাজ্জুব লাগল কথাগুলো শুনে। গোজু কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থেকে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

ননীদা চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। ভাবছিলেন উদয় এখন কোথায়! কোথায় কত দূরে!